496

গিরি-কাহিনী।

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

শিলং হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রাপ্তি স্থান—
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী,
ঢাকা।

PRINTED BY S. A. GUNNY

at the Alexandra Steam Machine Press,

পূজ্যপাদ

পিতৃ-দেব

ও

পুণ্যস্মরণীয়া

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

শ্রীচরণোপান্তে

এই

অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম।

সেবক

শ্রীপ্রিয়কুমার।

উপহার।

শৈশবের সহচর,
প্রবাসের সাথী,
অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু যাহারা আমার,
আজি এ নির্ম্মাল্য লয়ে,
হরষ হৃদয়ে,
অর্পিলাম তাহাদের করে উপহার !

বহুদিন অদর্শনে,
যদি কার (ও) মনে,
নাহি থাকে স্নেহ-মায়া না থাকে সম্প্রীতি,
অকৃতের অনুরোধ,
রেখ গো যতনে,
ক্ষুদ্র এই দান তার,—স্মরি পূর্ব্বস্মৃতি !

শ্রীপ্রিয়কুমার—

নিবেদন।

দীর্ঘকাল কঠোর প্রবাস-জীবনের মধ্যে এতদ্দেশ-সংশ্লিষ্ট যে কয়েকটী গল্প সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা অযত্নে লিপিবদ্ধ ছিল। দু'একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর অনুরোধে আজ "গিরি-কাহিনী" নামে সেইগুলি প্রকাশ করিলাম। আবশ্যক বোধে 'প্রবাসের ইতিহাসে' খাসিয়া জাতির সম্বন্ধে দু'চারিটী কথাও বলিয়াছি। সাহিত্য-সেবিগণ মার্জ্জনা করিবেন।

শিলং
আশ্বিন,
১৩১৮।

বিনয়াবনত
লেখক।

—*—

ত্রুটি-স্বীকার।

সময়ের অল্পতাবশতঃ এবং নিজে দূরদেশে অবস্থান হেতু সমস্ত প্রুফগুলি ভালরূপে দেখিয়া দিতে না পারায়, পুস্তকের স্থানে স্থানে, অনেক প্রকার মুদ্রাযন্ত্রের ভুল রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অন্যবিধ ত্রুটির সহিত লেখকের এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

সূচী।

চিত্র-সূচী।

গিরি-কাহিনী।

প্রথম কথা।

(১)

তখন গ্রীষ্মের ছুটী সবে আরম্ভ হইয়াছে। নিদাঘের দারুণ উত্তাপ ক্রমশঃই অসহ্য বোধ হওয়ায় মনে মনে স্থির করিলাম, কিছুদিন অন্যত্র কোথাও যাইয়া এই সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করিব। কোনও এক পার্ব্বত্য-প্রদেশ দেখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম; কিন্তু কতবার, কত অভূতপূর্ব্ব-ঘটনা যে আমার সে ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইবার কৃতসঙ্কল্প হইলাম যে কোন প্রকারে একবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। কিন্তু কোথায় যাইব?—শিমলা, দার্জ্জিলিং না মসূরী দেরাদূন!—কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। এইরূপে ছুটীর কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

একদিন অতি প্রত্যূষে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেছি, এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম হস্তগত হইল। উৎসুক হইয়া খুলিয়া

দেখিলাম, আমারই কোনও প্রবাসী বন্ধু তাঁহার নিকট যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কোন সরকারি কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি তখন আসামের রাজধানী শিলংনগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শিলংএর নাম শুনি নাই। দু'এক জন বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা ভুগোলতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন! কেহ কেহ বলিলেন যে শিলং যাইতে হইলে "কামরূপ-কামাখ্যা" অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—কিন্তু সেখানে যাইলে নাকি মোহিনী-মন্ত্রে মানুষকে ভেড়া করিয়া রাখে! সুতরাং পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন ত দূর কল্পনার কথা, তাঁহাদের মতে আমার শিলং পর্য্যন্ত পৌঁছান ও বিশেষ সন্দেহের কারণ!

কি করি! একে গ্রীষ্মের দারুণ প্রকোপ—তাহাতে নিতান্ত কর্ম্মহীনের ন্যায় জীবন—কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। এদিকে দেখিতে দেখিতে ছুটীও আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে, অনেক চিন্তার পর অনেকের অমত সত্ত্বেও বন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাহার করিতে পারিলাম না।

(২)

সে দিন বৃহস্পতিবার। তখন অস্তগমনোম্মুখ সূর্য্য পশ্চিমাকাশে প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আত্মীয় স্বজন,

বন্ধু বান্ধব সকলের নিকট যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া, আমি প্রথম প্রবাস যাত্রা করিলাম।

যথা সময়ে দারজিলিং মেলে আরোহণ করিয়া রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় "দামুকদিয়া" পৌঁছিলাম। শুনিলাম, এখান হইতে 'সাঁড়া' পর্য্যন্ত পার হইয়া যাইতে হয়—এবং সাঁড়া হইতে ট্রেণে আসাম অঞ্চলে যাওয়া যায়। আমি এ পথে নূতন পথিক—পথ ঘাট সমস্ত অপরিজ্ঞাত; সুতরাং অন্যান্য সকলের দৃষ্টান্তানুকরণে আমিও ষ্টীমারে গমন করিলাম। অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টা পরে সাঁড়া পৌঁছিয়া আসাম মেলে, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে, নিতান্ত সঙ্কুচিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলাম।

হুহুঁ শব্দে আসাম 'মেল' চলিতেছে—নিকটে সঙ্গী মাত্র নাই যে দু'দণ্ড আলাপ করিব। সুতরাং মনে স্বতঃই নানারূপ চিন্তার উদয় হইল। আমি অনন্যোপায় হইয়া চিন্তাস্রোতে মন ঢালিয়া দিলাম।

রাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু রজনী প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল—শুনিলাম ট্রেণের দুই পার্শ্ব হইতে শব্দ হইতেছে "বাবু কুলি—বাবু কুলি"; বুঝিলাম আমরা ধুবড়ি-ঘাট আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন পুনরায় জাহাজে চড়িয়া গৌহাটির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

রথাবতরণ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র ধীর গম্ভীর ভাবে প্রবাহিত—একাধিক বাষ্পীয় পোত শ্রেণীবদ্ধরূপে তীরে সংলগ্ন। দূরে সেই কল কল নাদী অনন্তকাল প্রবাহমান

মহানদের বিচলিত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দলভুক্ত পিঙ্গলিকাবৎ অসংখ্য তরণী বিবিধ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাইল উন্নত করিয়া আপন আপন গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেছে।

ধুবড়ি হইতে আমরা পোতারোহণ করিয়া গৌহাটির পথে চলিতে লাগিলাম।

(৩)

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। আমরা ধুবড়ি ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার্শ্বে এখন কেবল ঘন-নীল বর্ণের সমুন্নত গিরিশ্রেণী ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। নদ-বক্ষে ক্বচিৎ কোথাও দু'এক খানি ক্ষুদ্র তরণী সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্ষেপণি-নিক্ষেপ শব্দে আপনার অস্তিত্ব ব্যক্ত করিয়া উদ্দেশ্য পথে চলিতেছে। কোথাও পর্ব্বত-শৃঙ্গে—কোথাও বা গিরিমূলে, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দু'একটি ভগ্ন-মন্দির সগৌরবে এখনও হিন্দুর অতীত কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্থানে স্থানে নদীচরে রোমন্থন-রত কতকগুলি আরণ্য-পশু উন্নত-শৃঙ্গে পারিমুখিক বাষ্পীয় পোতের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে কিরণ-মালী ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লইলেন। শুক্লপক্ষ রজনী—উপরে অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকা বিখচিত চন্দ্রাতপ—নিম্নে নদীবক্ষে অমল ধবল পূর্ণশশীর অপরূপ প্রতিবিম্ব—উভয় পার্শ্বে জ্যোৎস্নারঞ্জিত স্থাবর-জঙ্গমের

অপূর্ব্ব শোভারাশি, আমাদের মনে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ উৎপাদন করিতেছিল। আমরা এক মনে এই সকল শোভা-রাশি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সহসা "ডেকের" উপর একটি অস্ফুট চীৎকার ধ্বনিতে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে—মনুষ্য-জীবনে ঘৃণা জন্মে। মানব যে এত নীচ—এতদূর পিশাচ প্রকৃতির হইতে পারে তৎপূর্ব্বে কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই।

ধুবড়ী হইতে যখন প্রথমে ষ্টীমারে উঠি তখন দেখিলাম "ডেকের" প্রায় অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া, লাল পিরাণ পরিহিত অনেকগুলি নরনারী—বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী অবস্থান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে কুলী চালানের কথা শুনিয়াছিলাম—এবার স্বচক্ষে দেখিলাম। ইহারা সকলেই আপনাকে দাসখতে আবদ্ধ করিয়া "আসামের চা বাগিচায়" সৌভাগ্যলাভে (!!) গমন করিতেছে। জানি না তাহারা অভীপ্সিত ঐশ্বর্য্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে কি না! সেই শতাধিক নরনারীর মধ্যে একটি তরুণী বিশেষরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দু'একটি সহযাত্রী প্রমুখাৎ শুনিলাম অভাগিনী শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীনা অভিভাবক শূন্যা হইয়া—জঠর জ্বালায় অনন্যোপায় হইয়া আড়কাটীর প্রলোভন স্রোতে স্বেচ্ছায় আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে!

* * * * *

চীৎকার শ্রবণে আমি ডেকের দিকে নয়ন ফিরাইলাম, কিন্তু বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল দেখিলাম একস্থানে দু'চারি জন যাত্রী পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যেন কাহারও বিষয় কি আলোচনা করিতেছে। একাগ্রচিত্তে কাণ পাতিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল—সহসা সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম সেই হতভাগিনী কুলি রমণীই তাহাদের আলোচনার বিষয়।

আমি অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ একজনকে নিকটে ডাকিয়া একান্ত উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"ব্যাপার কি ম'শায় ?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না—বোধ হয় আজ একটী অভাগিনী কুলি-রমণীর চিরদিনের মত কপাল পুড়্‌'ল।"

"সে কি—?"

প্রত্যুত্তর পাইবার পূর্ব্বে "ডেকের" প্রান্ত ভাগ হইতে কাহার এক অত্যুচ্চ হাস্যরব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম—বোধ হইল যেন রঙ্গরস-বিভোর, মদিরা পানোন্মত্ত ডাক্তার!

লোকটী বলিতে লাগিল—

'আহারান্তে সন্ধ্যার পর যখন কুলীবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল, তখন ডাক্তার আসিয়া একবার সকলকে পরীক্ষা করিয়া যান। কিছুক্ষণ পরে কি জানি কেন, বলিতে পারি না—বালিকাটিকে "ডেকের" প্রান্তভাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

তাহার পর কি হইয়াছে জানিনা—কিন্তু একবার মাত্র বালিকার একটি আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইয়াছিলাম।’

হায়—হায়! জাহাজে প্রায় শতাধিক নরনারী বিদ্যমান থাকিতে একটি অনাথা বালিকার প্রতি এই দারুণ অত্যাচার! নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল—মর্ম্মাহত হইয়া স্বীয় “কেবিনে” প্রবেশ করিলাম।

(৪)

সমস্ত রাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই। কি জানি কেন অভাগিনীর দুর্দ্দশার. কথা কেবল স্মরণ পথে উদয় হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কেবিনের বাহির হইয়া দেখি ব্রহ্মপুত্র গর্ভোত্থিত রমণীয় ক্ষুদ্র পাহাড়ে উমানন্দ মন্দির। আমি ভক্তিভরে সেই ভৈরবেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণিপাত করিলাম। আরোহীবর্গ গৌহাটী সন্নিকট বলিয়া, স্ব স্ব বিছানা-পত্র গুছাইতে লাগিলেন। আমি বালিকার কথা দু’এক জনকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, হতভাগিনী না কি শেষ রাত্রে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া ইহকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে !!

গৌহাটী পৌঁছিয়া যথাসময়ে দ্বিচক্র অশ্বযানে শিলং রওনা হইলাম।

শিলং এর পথ বড়ই মনোরম। রাজকীয় পথের উভয় পার্শ্বে সংখ্যাতীত উচ্চ পর্ব্বতমালা—পাদদেশে চিরপ্রবাহমানা বেগবতী স্রোতস্বতীকুল—কাহার অনন্তপ্রেমে, অপূর্ব্ব মোহিনী ভঙ্গিতে

মুগ্ধ হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় নিরন্তর ছুটিতেছে! হিমকণবাহী স্নিগ্ধ-শীতল সমীরণ ঝির ঝির শব্দে, পর্ব্বতগাত্রে ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজির গুরু গাম্ভীর্য্য উপেক্ষা করিয়া, সীমা হইতে সীমান্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

আমি সমস্ত পথ এইরূপশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিলং সহরে পৌঁছিয়া বন্ধুর গৃহে অতিথি হইলাম।



গিরি-কাহিনী।

শৈল-শিখরে।

নৃত্যোৎসব।

শিলং শীতপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নিদাঘ তপনের তপ্তকিরণ মালা এক এক সময়ে বেশ তীব্র হইয়া উঠে—তবে তাহার কঠোরতা তত অসুখ দায়ক নহে।

আজ নংক্রেম রাজ-প্রাসাদে উৎসব। সরকারি আপিসাদি বন্ধ। শুনিলাম "লাট" হইতে "গমিস" এবং "বাবু" হইতে ফেরীওয়ালা প্রায় সকলেই উৎসব ক্ষেত্রে গমন করে। এই উৎসব অবশ্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তাহার উপর খাসিয়া রমণীর নৃত্য—দেখিবার সামগ্রী বটে! অন্যান্য কয়েকটি বন্ধু বান্ধবের সহিত আমিও তথায় যাইবার মন করিলাম।

শিলং হইতে নংক্রেম রাজভবন কিঞ্চিদধিক সপ্ত মাইল ব্যবধান—একটি উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া শৈলশিখরস্থ উৎসবস্থলে যাইতে হইবে।

আমি পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নূতন আগমন করিয়াছি—সুতরাং পর্ব্বত পথ ভাঙ্গিয়া সার্দ্ধ সপ্ত ক্রোশ যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর হইবে বলিয়া অনেকেই প্রথমে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আমার একান্ত ইচ্ছা দর্শনে যাইতে সম্মতি প্রদান করেন।

বেলা দ্বি-প্রহর। মধ্যাহ্ন গগণে প্রচণ্ড তপন স্বীয় প্রখর কিরণে হিমক্লিষ্ট পর্ব্বত গাত্র তাপান্বিত করিতেছে—মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ—ধরণী স্তব্ধ—অনিলের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও যেন অনুভূত হইতেছে না—আমরা গিরি-পথে চলিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য নর নারী, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদব্রজে, কেহবা 'থাপা' আরোহণে উৎসব স্থলাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

পর্ব্বতারোহণে আমাদের দু' একবার বিশ্রাম লাভ করিতে হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম নিম্নে শিলং সহর একখানি রমণীয় দৃশ্যপটের মত শোভা পাইতেছে। চতুঃপার্শ্বে—আস্তরণ সজ্জিত-করি-পৃষ্ঠের ন্যায় বিবিধ বনলতা সমাচ্ছাদিত অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ—মধ্যে মধ্যে বালুকাময় সমতল ভূমি, সেই শৃঙ্গগুলির উচ্চ নীচত্বের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করিতেছে—অতি দূরে চির যৌবন ব্রহ্মপুত্রের অনন্ত প্রেম প্রবাহে' আত্মোৎসর্গ করিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কেহবা ক্ষীণ ঋজু তরঙ্গ তুলিয়া ঝুর ঝুর রবে—কেহবা যৌবনের খর-প্রবাহে ভূধর-ভবন প্রপূরিত করিয়া ছুটিতেছে।



শিলং সহর।

১০ পৃঃ।

(২)

নংক্রেম রাজ ভবন লোকে লোকারণ্য—উৎসব প্রাঙ্গণ চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ-প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ। তাহারই মধ্যে খাসিয়া রমণীর নৃত্য হইতেছে। আমরা জনতা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি ক্ষীণ-কটি শ্বেতাঙ্গ-মহিলা শ্বেত-পুরুষগণের সহিত এ দৃশ্য দর্শনে আগমন করিয়াছেন।

খাসিয়া রমণীগণ অনেকেই মস্তকাবরণ বিহীন—আমোদ-প্রমোদ বিভোরা! সেই 'অলস অঙ্গ শিথিল কবরী' খস্‌রমণীর রূপ মোহে মোহিত হইয়া, শুনা যায় কেহ কেহ নাকি সেই খানেই 'বিভাবরী' পোহাইয়া আসেন!

খাসিয়ানীর নাচ এক অপূর্ব্ব সামগ্রী—যিনি দেখিয়াছেন, তিনি মজিয়াছেন—যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার। সে নৃত্য বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ইতিপূর্ব্বে জনৈক 'আসাম-প্রবাসী' এই নাচ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"খাসিয়া রমণীর নৃত্য দেখিবার সামগ্রী বটে; সে নৃত্যে চলনের চটুলতা নাই, কটাক্ষের ভ্রূভঙ্গি নাই, নিতম্বের আস্ফোট নাই—সে নৃত্য ধীর, স্থির, গম্ভীর—চরণ চলি চলি চলে না—দেহলতা দুলি' দুলি' দোলেনা, মুখ কমল ফুটি' ফুটি' ফোটেনা! সে নৃত্য দেখিবার সামগ্রী, বুঝাইবার নহে।" নর্ত্তন-প্রিয় পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এই অপূর্ব্ব নাচের একখানি চিত্র সংযোজিত করিয়া দিলাম।

প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই অপরূপ নৃত্য হইতে থাকে। সকলে ইহাতে যোগদান করিতে পারে না—কুমারী ভিন্ন এই উৎসবে অপর কোনও রমণীর নাচিবার অধিকার নাই।

উৎসব স্থলের এক প্রান্তে খাসিয়া মহিলাদিগের বসিবার স্থান—অন্যত্র 'সি-এম্' গণের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে। 'সি-এম্' গণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। খাসিয়ারা তাহাদিগকে যুগপৎ ভয় এবং ভক্তি করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোক দিগের বিশ্বাস "সি-এম"-গণ 'ঈশ্বর প্রেরিত শাসনকর্ত্তা'—ভগবান কৃপা করিয়া স্বেচ্ছায় খাসিয়া রাজ্য শাসন করিবার জন্য, তাহাদিগকে ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছেন। এই সকল 'সি-এম্' গণের পূর্ব্ব পুরুষের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহা এই—

(৩)

যৌবন গর্ব্বে স্ফীত বক্ষে "ইয়াম" গিরি-শ্রেণী ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। নদী তীরে একটি নাতি বৃহৎ গহ্বর—লোকে ইহাকে "মরাই" গহ্বর বলিত। এই গহ্বরাভ্যন্তরে একটী অসামান্যা রূপ-লাবণ্য সম্পন্না তরুণীকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত। কেহ জানিতনা—সে কে। কিন্তু যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে, সে কখন ও তাহার সেই অনিন্দ্য সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব, তপ্ত কাঞ্চন নিভ দেহ কান্তি—সেই অযত্ন-বিন্যস্ত



নংক্রেম নৃত্যোৎসব।

১১ পৃঃ।

চূর্ণ কুন্তল রাশি—ক্ষুদ্র কমনীয় ললাট—সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগল—খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি—ভুলিতে সক্ষম হয় নাই। বালিকা কখনও সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিত না। কত লোকে কত অনুরোধ—কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে—কত অনুনয় বিনয় করিয়াছে—কত বল প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই।

ক্রমে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—অতিবাহিত হইল—বালিকা এখন যৌবনভার নিপীড়িতা—তথাপি কাহাকেও জীবন-কাণ্ডারী করিল না। এদিকে তাহার রূপরাশির কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মৃগয়ান্বেষী কোন ও রাজকুমার এই সময় 'ইয়াম' নদীর উত্তরাংশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন—রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত্র তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন।

মৃগয়ান্তে যথাসময়ে অনুচরবর্গাদি সকলে ফিরিয়া গেল—রহিলেন কেবল সেই নির্জ্জন নদীতীরে রাজকুমার একাকী।

প্রতি প্রভাতে ও সায়াহ্ন সময়ে রাজকুমার নিত্য নূতন উপহারাদি লইয়া সেই অপরিচিতা অনুপমা কামিনীর নিকট উপস্থিত হইতেন—যদি প্রলোভন জাল পাতিয়া অবলাকে কোনও প্রকারে আবদ্ধ করিতে পারেন। রাজকুমার নানারূপ উপায় উদ্ভাবন স্বত্বে ও কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না।

যুবতী কোন দিন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই—সুতরাং তাঁহার কাছেও সে মৌনী রহিত। রাজ-কুমার দেখিলেন,

আর কোন আশা নাই! একবার ভাবিলেন স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইবেন—পরক্ষণেই আবার ইচ্ছা হইল সুড়ঙ্গ মধ্যে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সেই অপূর্ব্ব রমণী-রত্ন উদ্ধার করিবেন। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়-ভূমি আলোড়িত করিয়া তুলিত—নিরাশ প্রণয়ের তীব্র জ্বালা তাঁহার প্রাণ দগ্ধ করিতে থাকিত, কিন্তু কি করিবেন—উপায় নাই!

(৪)

একদিন সায়াহ্ন-রবি পশ্চিম গগণে প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন—অনন্যোপায় হইয়া রাজকুমার যুবতী-রত্ন উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইলেন। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিলেন গহ্বর অন্ধকার ময়—মুখ প্রদেশ অতিশয় সূক্ষ্ম—ভিতরে প্রবেশ দুঃসাধ্য—কোনরূপে প্রবিষ্ট হইলেও উঠিবার আশা নাই। যুবরাজের প্রাণের মমতা জন্মিল—তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন—ক্ষুব্ধ চিত্তে নিকটবর্ত্তী একটি তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নীরবে রজনী প্রভাত হইল। নিদ্রাভঙ্গে রাজকুমার দেখিলেন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটি বন্যকুসুম রূপের বিভায় কানন ভূমি আলোকিত করিয়া, মৃদু মন্দ প্রভাত সমীরে সৌরভ বিতরণে রত! তিনি ফুল-রাণীকে বৃন্তচ্যুত করিয়া আর একবার তাঁহার মানসদেবীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আজ যুবতী রাজকুমারের হস্তস্থিত কুসুমটির প্রতি একবার উৎসুক নয়নে চাহিল।

রাজকুমার লক্ষ্য করিলেন, যুবতী যেন ঈষৎ বিচলিত—যেন পুষ্পটি লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে! মুগ্ধ যুবক কামিনীকে সেই কুসুম অর্পনের প্রলোভন দেখাইলেন—রমণী আগ্রহ সহকারে গুহার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিল। যুবক ইঙ্গিত করিলেন, যুবতী আর নড়িল না—সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক আত্ম বিহ্বল হইয়া দুইবাহু প্রসারণে যুবতীকে আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন—যুবতী মনোভাব বুঝিয়া দ্রুতপদে সুড়ঙ্গপথে নামিয়া গেল—কিন্তু রাজকুমার আত্মবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অচিরে সুড়ঙ্গ মধ্যে নিপতিত হইলেন।

* * * *

ইহার পর অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে—রাজকুমার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ব্যাকুল অমাত্যগণ তাঁহার অন্বেষণে পুনরায় "ইয়াম" নদী তীরে উপস্থিত—ক্রমে ক্রমে তাহারা গহ্বর সমীপবর্ত্তী হইল—কিন্তু রাজকুমার কিম্বা সেই অজ্ঞাত কুলশীলা রমণী—কাহাকে ও দেখিতে পাইল না। দুঃখিতান্তঃকরণে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—সহসা বালক কণ্ঠ নিঃসৃত এক সুমধুর গীত ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল—সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া তাহারা পুনরায় ফিরিল—স্থির চিত্তে শুনিল গহ্বরাভ্যন্তর হইতে সেই অপূর্ব্ব গীত লহরী উত্থিত হইতেছে। সঙ্গীত ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল—তখন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল কয়েকটি স্বর্গীয় শিশু সেই সুড়ঙ্গ মুখে বিচরণ করিতেছে।

অমাত্যগণের ইঙ্গিতানুক্রমে বালকগণ বিনা আপত্তিতে সুড়ঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। জন্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই বলিতে পারিত না। এদিকে ক্রমে তাহাদের দেখিবার জন্য নানা দেশ হইতে নানা লোকের সমাগম হইতে লাগিল—সকলেই বালকগণের আচার ব্যবহার, বিনয় শিষ্টাচার দর্শনে মোহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়িক খাসিয়াগণ তাহাদিগকে দেব পুত্র বলিয়া স্বীয় স্বীয় নেতৃত্ব পদে বরণ করিল। খাসিয়াদের ধারণা যে উক্ত যুবতী ঈশ্বর কন্যা—সুতরাং তাহার পুত্রাদিরও দেব-অংশে জন্ম হইয়াছে, সুতরাং শাসন বিষয়ে তাহারাই সমধিক যোগ্য পাত্র। এই "সি-এম্" রা ই উক্ত দেব বংশীয়।

* * * *

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এই মনোহর (?) নৃত্য দর্শন করিয়া নয়ন মনের খেদ মিটাইলাম। ভাবিলাম—"না আসাই ছিল ভাল"—। বস্তুতঃ খাসিয়ার নাচ "দিল্লীর লাড্ডু"! আমরা এই অপূর্ব্ব "লাড্ডুতে" বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিলাম!

শৈল-শিখরে।

(ডিঞ্জি-পর্ব্বত—বাঁশরী)।

কাল সূর্য্য গ্রহণ। আফিসে গিয়া দেখিলাম Holiday slip (ছুটীর কাগজ) বাহির হইয়াছে। বড় বাবু একটু গম্ভীর মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ কা’র ২ ছুটীর আবশ্যক হে?” ছুটী নিশ্চয় হইবে জানিতাম—এবং উক্তরূপ জিজ্ঞাসাবাদও অধিকন্তু, তথাপি কেহ উত্তর করিলনা। সুতরাং আমিই উদ্দেশ্যে বড় বাবুকে বলিলাম “মহাশয়, হিন্দুর ছেলে, গ্রহণের সময় অন্য কোনও কাজকর্ম্ম করিতে নেই—পূজা আহ্নিক কর্‌বো—আস্‌তে পার্‌বোনা;—আর যখন পূর্ণ গ্রাস, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে, ছুটি না হ’লেও আফিসে ত আর কাজ করা যাবেনা!”

পার্শ্বে জনৈক খাসিয়া বন্ধু কাজ করিতে ছিলেন—তিনি আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সভ্য হইতে পারেন নাই (!)—খাসিয়া ধর্ম্মেই তিনি সন্তুষ্ট। আমার কথা শুনিয়া বন্ধু

সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"একদিন পৃথিবীত অন্ধকার-গর্ভেই নিহিত ছিল, কিন্তু তখন কি মানবেরা কাজ কর্ম্ম করিত না" ?

"সে কি ?—আমার বোধ হয়, জগৎ যখন চির-তামস-নিমগ্ন ছিল, তখন মানবের সৃষ্টি হয় নাই—তবে কাজ করিবে কে ?"

"তবে তোমরা জাননা ; মানবের সৃষ্টি হইবার বহুদিন পর পর্য্যন্তও ধরণী তমসাচ্ছন্ন ছিল।

"তা'রপর সে অন্ধকাব দূরীভূত হইল কিরূপে ?—বলিতেছি তবে শোন—

আমার কয়েকটি সহকর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া বন্ধুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলাম। বড় বাবু মনে মনে কিঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিলেও, প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। ফল কথা, বন্ধুটির বিবরণ শুনিবার জন্য তিনিও একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন।

বন্ধুবর বলিতে লাগিলেন :—"কিছু পূর্ব্বকালে ডিঞ্জি (Dinjiei) পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে শাখা-পল্লবে সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া একটি অতি প্রকাণ্ড-কাণ্ড-মহীরুহ বিদ্যমান ছিল। খাসিয়াগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে যদি কোনও প্রকারে তাহারা উক্ত বৃক্ষটি ছেদন করিতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে আলোক প্রবেশ করে এবং ধরণীও অধিক পরিমাণে শস্যশালিনী হয়। অনন্তর তাহারা চরাচরের লোক একত্রিক করিয়া, এক দিবস বৃক্ষটি কর্ত্তন করিতে কৃত সংকল্প হইল। প্রথম দিবস সূর্য্যোদয়

হইতে সায়াহ্ন কাল পর্য্যন্ত অবিরাম কার্য্য চালনার পর, সকলে একান্ত ক্লান্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরদিন প্রভাতে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলে দেখিল যে, পূর্ব্ব-দিনের কর্ত্তনচিহ্ন সমস্ত তরুগাত্রে মিলাইয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনে তাহারা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুনরায় বৃক্ষকাণ্ডের কতকাংশ কাটিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবস, অতি প্রত্যূষে সকলে দেখিতে পাইল যে সে দিনও পূর্ব্বকার মত তরুগাত্রে কর্ত্তন ক্ষত বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাহারা, নিজেদের অকৃতকার্য্যতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে, তাহাদিগকে অত্যন্ত চিন্তা-কুলিত দেখিয়া সেই তরু কোটরাশ্রয়ী একটি ক্ষুদ্র পক্ষীর মনে কিছু দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাহাদিগকে, চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, একটি লোক তাহাদের সকল বৃত্তান্ত পক্ষীকে নিবেদন করিল। পাখী উত্তর করিল, যে প্রতি নিশিযোগে একটি বৃহল্লাঙ্গুল শার্দ্দূল তরুতলে আসিয়া জিহ্বাদ্বারা ছেদিত স্থানগুলি চাটিয়া যায়, সে শুদ্ধ এই মাত্র দেখিয়াছে। এতৎ শ্রবণে খাসিয়াগণ সেই দিবস বৃক্ষটি ছেদন করিয়া তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রাদি সেই সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। অন্যান্য দিনের ন্যায় ব্যাঘ্রটি, রজনীতে তরুতলে আসিয়া কর্ত্তিত স্থান সকল লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল—কিন্তু অত্যল্প-ক্ষণ মধেই, রক্ষিত অস্ত্রাদিতে, তাহার জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল'। ব্যাঘ্রটি তদবধি আর আসিত না।

তখন খাসিয়াগণ, ক্রমে ক্রমে সেই বিশাল পাদপ উৎপাটনে কৃতকার্য্য হইল—এবং সে দিন হইতে পৃথিবীতে সূর্য্য এবং চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতে পারিল।

এক্ষণে যদ্যপি সে গাছটি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত বৃক্ষের কাণ্ডের পরিধি পরিমিত পর্ব্বত শিখরে এমন একটি গহ্বর আছে যে তদ্দর্শনে সকলে সহজেই তরুটির আয়তন উপলব্ধি করিতে পারে।

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। স্থির করিলাম একদিন যাইয়া উক্ত গহ্বরটি দেখিয়া আসিব।

(৩)

এই সময় ঘটনাচক্রে আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইবার কিছু সুবিধাও ঘটিল। আরাকান অঞ্চলের তার বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী অবকাশ গ্রহণ করিয়া শিলংএ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য খাসিয়ার রীতি নীতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। তাঁহারই একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া একদিন রবিবারে খাসিয়া বন্ধুটির সমভিব্যহারে আমরা “ডিঙ্গি” পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর—প্রভাতে আট ঘটিকার সময় গৃহের বাহির হইয়াছি—এখনও ক্রমাগত পথ চলিতে হইতেছে। “ডিঙ্গি” পর্ব্বক কতদূর জানি না—পিপাসায় কণ্ঠ-তালু শুষ্কপ্রায়। যে কয়েকটি কমলা ও ইক্ষুদণ্ড সঙ্গে আনা হইয়াছিল,

তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। আমি বন্ধুকে পুনঃ পুনঃ "ডিম্পি" পর্ব্বতের দূরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। অনবরত জিজ্ঞাসাবাদে বন্ধুবর কথঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি কষ্ট হইতেছে চল—ফিরিয়া যাই— "ডিম্পি-পর্ব্বত এখনও অনেক দূর।" বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি একবার আগন্তুক ব্যক্তির মুখপানে চাহিলাম—তাঁহার বোধ হয় বাস্তবিকই অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল—কেননা মনো-ভাবে বুঝিলাম, তাঁহারও ইচ্ছা ফিরিয়া যাওয়া !

পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, গৃহে ফিরিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় নাই।

অনতিদূরে একটি খাসিয়া পল্লী দেখিতে পাইয়া, আগন্তুক সুহৃদটিকে কহিলাম—"চলুন ঐ পল্লীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় গন্তব্য স্থানে রওনা হইব।"

বন্ধু ম্লানমুখে উত্তর করিলেন—"সেই ভাল,,—

আমরা কথিত "পুঞ্জি"তে পৌঁছিয়া বিশ্রাম লাভে যত্নপর হইলাম।

অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম লাভ করিয়া আমরা তিনজনে পুনরায় অভীপ্সিত স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একটি সারমেয় আমাদের সঙ্গ লইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আমি অনেকবার প্রস্তর খণ্ডদ্বারা তাড়না করিলেও শ্বা-প্রবর যাইতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। আমি তথাপি পুনঃ পুনঃ ঢিল ছুড়িতেছিলাম। শেষ বার একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম—

চিলটি বন্ধুর গায়ে লাগিল। আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। থাসিয়া বন্ধু বলিলেন—

"কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ—কুকুর কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়িবেনা।"

"কেন?—"

"কুকুর যে মানবের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে—সে যে মানুষের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ।"

বন্ধুর কথা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমাদের আশ্চর্য্যন্বিত দেখিয়া বন্ধু যাহা বলিলেন; তাহার সার মর্ম্ম এই—

"অতি পূর্ব্বকালে সমস্ত জীবজন্তু একত্র বাস করিত। একত্র ভোজন—একত্র ভ্রমণ—একত্র বেচাকেনা তাহাদের পদ্ধতি ছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া একটি সাধারণ বিপণী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই বিপণীর নাম ছিল "লুরি-লুরা।" একদিন সেই "লুরি-লুরা" বিপণীতে, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একটি কুকুর কতকগুলি পচা কলাই বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল, এবং সেই কলাই ক্রয় করিবার জন্য অপর সকল পশুকে বিস্তর অনুরোধ করিতেছিল। ইহাতে প্রাণিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া পদাঘাতে তাহার কলাইগুলি নিষ্পেষিত করিয়া সমস্ত বিপণীময় ছড়াইয়া দিল। কুকুর দুঃখিতান্তকরণে তদানীন্তন পশ্বাচার্য্য শার্দ্দূলের নিকট গমন করিয়া যথাযথ নিবেদন করিল। ব্যাঘ্রও কুকুরের ব্যবহারে প্রীত না হইয়া,

তাহাকে তিরস্কার করিল। আচার্য্যের পরামর্শানুযায়ী সকলে কুকুরকে "এক ঘরে" করিল। সমগ্র কুকুর-জাতি তখন অন্যন্তোপায় হইয়া মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিবেদন করিল —তাহারা মানুষকে শীকার-কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। মানবগণ বিপন্ন শ্বা-জাতিকে আশ্রয় দান করিয়াছিল। সেই অবধি কুকুর মানুষের কাছ ছাড়া হয় নাই—এবং সেই জন্য তাহারা এত প্রভুভক্ত !!"

(৪)

প্রভাতে যখন বাটীর বাহির হই, তখন কেহ কেহ আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ দু' একবার হাঁচি পড়িয়াছিল। জনৈক বয়ঃবৃদ্ধ বিদ্রূপ করিয়া করিয়া বলিয়াছিলেন—"যাচ্ছ—যাও—ফিরে আস্‌তে হ'বে—হিন্দুর ছেলে হাঁচি টিকটিকি মাননা"—

'ডিঙ্গি-পর্ব্বত দর্শনের একান্ত ইচ্ছা, তখন সে সকল মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পরে হাতে হাতে ফল পাইয়াছিলাম। কেন, বলিতেছি শুনুন—

আমরা যখন প্রায় উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিয়াছি, তখন চারিদিক সহসা অত্যন্ত কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইল। সম্মুখে পশ্চাতে কিছুই দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। অল্পক্ষণ পরে অনুভব করিলাম—যেন সর্ব্বাঙ্গে কি পড়িতেছে। কিছুই বুঝিতে পারা গেল না—কেবল দারুণ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। অনুমানে বুঝিলাম বৃষ্টিধারা নয়, কারণ নিশব্দে

পতিত হইতেছে—কোনও দিক হইতে ছাট আসিতেছে না। এদিকে এত কুয়াসা যে আমরা পরস্পরে পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না। অগত্যা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায়, সেইখানে শুদ্ধ মাত্র আতপত্র অবলম্বনে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যখন কুয়াসা কাটিয়া গেল, তখন দেখিলাম বেশ তুষার-পাত হইয়া গিয়াছে। উচ্চ পর্ব্বত-মালার শিখরদেশ অতিরিক্ত তুষারপাতে ধবলগিরির আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা ভয়ানক শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

খাসিয়া বন্ধুটী বোধ হয় রহস্য করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা এখনও ডিঙ্গি-পর্ব্বতে উঠিতে অভিলাষী কি না!

সমস্ত দিন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, কতকটা ভগ্ন-হৃদয়ে, সিক্ত কলেবরে আমরা গৃহাভিমুখে ফিরিলাম। আমাদের ডিঙ্গিপর্ব্বত শিখরের তরু গহ্বর দর্শন লালসা উদ্দেশে সিদ্ধ হইল। এবার যে পথে গিয়াছিলাম, সেই পথে না গিয়া তদপেক্ষা অপেক্ষাকৃত দুর কিন্তু সহজগম্য কানন পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম। আর্দ্র বসনে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল—সুতরাং যতদূর সম্ভব ত্বরিত পদে চলিতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া, আমরা কিছু অশ্চর্য্যান্বিত হইলাম কতকগুলি খসিয়া একটি মৃতের সৎকার করিতেছে। ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতা হইতে ধূমরাশী কুণ্ডলী আকারে উর্দ্ধে উঠিতেছে, চিতাপার্শ্বে সকলে ম্রীয়মান—



শিলা-সেতু। ৫৫ পৃঃ।

কেবল কতকগুলি ব্যক্তি সেই চিতাশয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া সুমধুর বংশীধ্বনি করিতেছে।

অন্য সময় হইলে আমি খসিয়াদের এই অপরূপ প্রথার মধ্যে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা না জানিয়া গৃহে ফিরিতাম কি না সন্দেহ—কিন্তু এস্থলে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা এক অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম—গৃহে ফিরিতে পারিলেই বাঁচি। আমরা অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অনতিকাল মধ্যে গৃহে পৌঁছিলাম।

পরদিন দু'একজন খাসিয়াকে ও এখানকার অতি প্রাচীন কয়েকটি অধিবাসীকে খাসিয়াদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কিন্তু কেহই সন্তোষজনক বিবরণ দানে সক্ষম হন নাই।

(৫)

এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে, এতদ্দেশবাসী খাসিয়া সম্বন্ধে লিখিত একখানি ইংরাজি পুস্তক হইতে খাসিয়াদিগের উক্তরূপ অপূর্ব্ব দাহ প্রথার বিষয় যে একটি আখ্যায়িকা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"খাসিয়া শৈলের উত্তরাংশে "বয়" প্রদেশ। এই প্রদেশে এক নির্জ্জন প্রান্তে মাণিক বাস করিত। শৈশবে মাতাপিতৃ-হীন ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মাণিকের ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন জীবন ধারণের আর কোন উপায় ছিলনা। দরিদ্র যুবক কখনও কাহারও সহানুভূত বা অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় নাই।

পিতৃবিয়োগের পর, স্বীয় অবস্থার কিছুই উন্নতি করিতে না পারায়, মাণিক অনুক্ষণ অশ্রুজলে ভাসিত। সংসারের মধ্যে আপনার বলিবার মাণিকের একটি বাঁশরী ছিল। যখন কোন কাজকর্ম্ম না থাকিত, তখন সে সেই বাঁশরী লইয়া আপনার দুঃখকাহিনী গাহিত। তাহার সেই দুঃখমিশ্রিত বংশীধ্বনি শুনিয়া অনেকেই নীরবে দু, এক ফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

কেন কেহ জানে না, মাণিক দিবাভাগে ছিন্ন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিত, কিন্তু রজনীযোগে যথা রীতি স্নানাদির পর একখানি পরিষ্কৃত বসন পরিয়া নির্জ্জনে বসিয়া বাঁশরী বাজাইত।

(৬)

একদিন, পূর্ণিমা রজনী সুষুপ্তিমগনা 'বয় প্রদেশ কৌমুদী কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে ছিল। রজনী নিস্তব্ধ। মাণিক ধীরে ধীরে উঠিয়া গিরি-নদীতে স্নান করিল। তাহার পর সেই পরিষ্কৃত বসনখানি পরিধান করিয়া তাহার প্রিয়তম বাঁশরীটি লইয়া, নিজের বিষাদময় কাহিনী গাহিতে আরম্ভ করিল।

'বয়' প্রদেশের যে প্রান্তে মাণিকের গৃহ, তাহার কিছু দূরে রাজ-প্রাসাদ। বয়-নৃপতি তখন রাজ কর্ম্মোপলক্ষে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন অনুপস্থিত ছিলেন।

'সে দিন মাণিকের সেই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি 'বয়রাণীর কর্ণ কুহরে প্রথম প্রবেশ করিল। রাণী মুগ্ধা হইলেন—ভাব-বিহ্বলার ন্যায়, সেই নিশীথে বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া 'বয়-রাণী মাণিকের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া রাণী দেখিলেন মাণিক আপনমনে বাঁশী বাজাইতেছে এবং অবিরত নয়নজলে তাহার বদন মণ্ডল সিক্ত হইতেছে। রাণীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি মাণিককে ডাকিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাণিক প্রথমে অত্যন্ত বিরক্ত হইল—কিন্তু যখন দেখিল এক অসামান্য রূপ-লাবণ্যযুক্তা যুবতী তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা, তখন আর সে থাকিতে পারিল না, মাণিক গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। রাণী আত্ম-হারা হইয়া সারা নিশি বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রত্যূষে প্রাসাদে গমন করিলেন।

'অপ্রতিহত কাল-স্রোত প্রবাহে মানব জীবনে কত পরিবর্ত্তন ঘটে, বলা যায় না। মাণিক বাঁশী বাজাইলেই, রাণী প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া মাণিকের গৃহে গমন করেন। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। মাণিক, রাণীর রূপযৌবনে মুগ্ধ হইল, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল।

* * * *

'কাল ক্রমে রাণী মাণিকের ঔরসে এক সন্তান প্রসব করি-লেন। মাণিক ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিচিলিত হইলনা।

রাণী কিন্তু তদবধি আর মাণিকের গৃহে গমন করিতেন না। মাণিক যেরূপ পূর্ব্বে বাঁশী বাজাইত এখনও তদ্রূপ বাজাইতে লাগিল।

'এদিকে 'বয়' প্রদেশ ময় কোলাহল পড়িয়াছে—আজ 'বয়' নৃপতির রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সকলে যথাসাধ্য ভেট লইয়া রাজ দর্শনাভিলাষে প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত। রাজ আগমন সংবাদে রাণী স্বীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া প্রমাদ গণিতে ছিলেন। তিনি শিশুটিকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন।

'সময়ের গতি অনিবার্য্য—কাহারও শুভাশুভের জন্য অপেক্ষা করেনা। রাজার যে দিন আসিবার কথা, সেদিন আসিলেন না। তৎপরদিন রাজা যখন প্রাসাদে ফিরিলেন, রাণী তখন অন্যমনা হইয়া শিশুটিকে আদর করিতে ব্যাস্ত!—রাজা তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি নিসন্তান ছিলেন। মনে মনে যৎপরনাস্তি আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া, রাণীকে শিশু 'সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সহসা রাজ আগমনে রাণী অপ্রস্তুত হইয়া রাজাকে কি বলিবেন কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রাজার তখন মনে কোনও সন্দেহ উদয় হয় নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও যখন রাজমহিষী কোনও প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন রাজা অতি সহজেই কিছু কিছু উপলব্ধি করিলেন—এবং ব্যাভিচারীকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

(৭)

'পরদিন প্রাতে রাজা আদেশ প্রচার করিলেন—রাজ্যে একটি বৃহৎ দরবার হইবে, তাহাতে রাজ্যশুদ্ধ সমগ্র প্রজা-মণ্ডলীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। যে কেহ অনুপস্থিত হইবে তাহার প্রতি অতি কঠোর দণ্ড বিধান হইবে।'

রাজ আজ্ঞায় অনুদিষ্ট হইয়া, নির্দ্ধারিত দিবসে, সমগ্র প্রজাকুল একত্রিত হইল। রাজা প্রত্যেকের হস্তে এক একটি সুপক্ক কদলী প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বৃত্তাকারে প্রাসাদের সম্মুখে বসিতে আদেশ দিলেন।

'সকলে যাথারীতি আসন গ্রহণ করতঃ উপবেশন করিলে, প্রাসাদাভ্যন্তর হইতে শিশুটিকে সেই মহতী সভা মধ্যে আনয়ন করা হইল। বয়-নৃপতি তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন'—

'হে প্রজাকুল! আমি এই অজ্ঞাত কুলশীল শিশুটিকে তোমাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। বালক যাহার নিকট গিয়া কদলী প্রার্থনা করিবে, সেই ব্যক্তি ইহার পিতা ও ব্যভিচারী সাব্যস্ত হইবে। রাজ-আজ্ঞায় লগুড়াঘাতে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।'

'নির্দ্দোষী প্রজাগণ সভয় অন্তরে বালকের মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে,—বালক কাহারও নিকট গমন করিল না। নৃপতির অশেষ অনুরোধ—বিস্তর প্রলোভন—প্রভূত তিরস্কার সত্ত্বেও বালক স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা

একান্ত অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ অনুপস্থিত আছে কি না। তখন চতুর্দ্দিকে সন্ধান করিয়া এক ব্যক্তি নিবেদন করিল, মাণিক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত আছে। রাজা অবিলম্বে সভাস্থলে মাণিককে আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। যথা সময়ে মাণিক রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে, শিশুটি সহাস্যে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাণিক তখন সেই প্রকাশ্য সভায় রাজ সমীপে সমস্ত কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিল। ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় নৃপতি, মাণিকের প্রতি জীবনদণ্ড বিধান করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।'

'প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া মাণিক কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত হইল না। সে ইতিপূর্ব্বেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল—এখন সে প্রতিক্ষণই ভাবে, তাহার সে পাপময় জীবনের অবসান হইলেই ভাল। যাহার সংসারে কেহ নাই—তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। মাণিক অন্তিমকালে প্রার্থনা করিয়াছিল,—রাজ-আইন অনুযায়ী কঠিন লগুড়াঘাতে প্রাণ বধ না করিয়া, তাহার ঘৃণিত জীবন যেন প্রজ্জ্বলিত চিতা মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।' *

'মাণিকের এই অন্তিমের আবেদন রাজ-সমীপে না-মঞ্জুর হয় নাই।'

* * * * *

* পূর্ব্বকালে (ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে) খাসিয়াদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড বিধান হইত। পাঠকগণ "প্রবাসের ইতিহাসে" সমস্ত না হইলেও কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন।

'রাজ-অনুচর সমভিব্যাহারে মাণিক শ্মশানে উপস্থিত। সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত চিতা-শয্যা—মাণিক নির্ভীক। আজ সে শেষবার গিরি-নদীতে স্নান করিয়া, একবার জন্মের মত বাঁশরী বাজাইল। তাহার পর তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম—সংসারের একমাত্র অবলম্বন বঁশরিটী ভূমিতলে প্রোথিত করিয়া, স্বীয় দেহভার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল।'

'এতক্ষণ কেহ লক্ষ্য করে নাই, বয়-রাণী অলক্ষ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে, শ্মশান-ভূমে আগমন করিয়াছিলেন। তিনিও চকিতের মধ্যে, মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে অনলকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া কলুষিত জীবনের অবসান করিলেন।—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল!'

'সেই হইতে আজও খাসিয়াদিগের মধ্যে মৃতের প্রতি শোকচিহ্ন প্রকাশার্থ, শবদাহের সময় চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, বিলাপসূচক বংশীধ্বনি করা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে।'



পরীস্থান।

(১)

বিশ্বরাজ্যের শোভা সম্বর্দ্ধনার্থ কত প্রাণমন মুগ্ধকর শোভার সৃষ্টি হইয়াছে ;—পার্ব্বতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য তন্মধ্যে একটি! এ দৃশ্য চিরসন্তাপিত মানব হৃদয়ে অনন্ত সুখশান্তিপ্রদায়িণী। যখন প্রথমে সেই চির-সুখাগার মাতৃভূমি ছাড়িয়া আসি, যে দিন 'বিদায় জন্মভূমি—বিদায়—বিদায় বলিয়া প্রণয়িণীর প্রেমপাশ, আত্মীয় স্বজনের প্রিয়সঙ্গ ছাড়িয়া এই সুদূর প্রবাসে আসিয়া পড়ি, সে দিন তখন আমিও পর্ব্বত দর্শনে যুগপৎ বিস্ময়াভিভূত ও মোহিত হইয়াছিলেন—তখন আমিও প্রকৃতির সে 'কি-জানি-কি' ভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলাম—সেই সারি সারি অচল গিরির স্থির ধীর গম্ভীর মুরতি—সেই পর্ব্বতে পর্ব্বতে গাঢ় আলিঙ্গন ভাব দেখিয়া, পথের সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত দুঃখ—একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সেই দিন জানিলাম পার্ব্বতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য কি মহান্—কি গম্ভীর—কি হৃদয়োন্মাদকারী! আহা! জীবন থাকিতে বুঝি সে দৃশ্য আর ভুলিতে পারিবনা!

যে দেশে আসিয়া পড়িয়াছি—কেবল পাহাড়—পাহাড়—পাহাড়! যেদিকে যখন তাকাই, সেই দিকেই অগণ্য পর্ব্বত শ্রেণী নগ্নচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে! কেহ বা উন্নত মস্তকে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে রত—কেহ বা গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধদেশে যাইতে উৎসুক!

পাহাড়ে দেখিবার জিনিষও অনেক। আর যেখানে পাহাড়ে পাহাড়ে এত কোলাকুলি ভাব—সেখানে যে প্রাকৃতিক শোভার ছড়াছড়ি, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কতবার পাহাড়ে উঠিয়াছি, কতবার প্রকৃতির নিত্য নব ভাব দর্শনে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়াছি! আর কতবার বিশ্বপতির অনিন্দ্য কারুকার্য্য—অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল—দেখিয়া এককালে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছি! তবুও সাধ মিটেনা! ইচ্ছ করে আবার দেখি—আবার দেখি! কিন্তু দেখিয়াও আশা মিটেনা! বুঝি এ আকাঙ্ক্ষা মিটিবার নয়!

(২)

তখন ৺শারদীয়া পূজার ছুটী! নির্জ্জন প্রবাসে—প্রিয়জন বিরহে, দাসত্ব জীবন বড় ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সবে আজ মাস কতক এখানে আসিয়াছি—ইহার মধ্যেই জীবনটা যেন কি রকম এক ঘেয়ে বোধ হইতেছে।—বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত স্থির হইল একদিন সহর ছাড়িয়া "পরীস্থানে" প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে যাইব। সহরে যে কোনও উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নাই, এমন নহে—কিন্তু শান্তিপ্রিয়া প্রকৃতিদেবী, কোলাহলময় লোকালয়ের মধ্য দিয়া যেন সচঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপে চলিয়া গিয়াছেন

—শোভারাশি সেখানে তত পরিস্ফুট হয় নাই; তাই দূরে—অতি দূরে—সভ্য-মনুষ্য-সমাগম-শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য আমরা প্রয়াসী!

তখন বেলা ১টা। 'পরীস্থান' দর্শনে অনেকদূর যাইতে হইবে সুতরাং আর বিলম্ব অনুচিত মনে করিয়া আমরা সকলে গৃহের বাহির হইলাম।

কোনও এক অপূর্ব্ব বস্তুর ভাবী দর্শন সুখের আস্বাদন আশে উৎফুল্ল হইয়া, আমরা কয়েকটী প্রাণী পর্ব্বতারোহণ করিতেছি। শ্যামল-পল্লবিত-স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায়, সুশীতল সমীরণ সেবনে, ক্লান্তি দূর করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি। নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যপ্রদেশ—প্রকৃতিদেবীর নির্জ্জন আবাস ভূমি কি মধুর স্থান! প্রভাকরের অসহ্য প্রখর উত্তাপে, পাছে বন-বিলাসিনী কানন-বালার সুকোমল তনুখানি শুষ্ক হইয়া যায়, এই ভয়ে যেন অগণ্য বিটপী শ্রেণী বদ্ধপরিকর হইয়া সূর্য্যকিরণের গতিরোধ করিতেছে! তাই বুঝি নির্জ্জন বন প্রদেশ এত শীতল!—এত আরাম দায়ক! আমরা চলিতেছি—কোলাহল বিরল শিলং সহর পশ্চাতে ফেলিয়া, আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। একটু ক্লান্তি বোধ হইতেছে;—অতি নিকটেই একটি পরিষ্কৃত তরুতল—বোধ হইল, পথশ্রান্ত অতিথিগণের জন্যই যেন বনদেবী স্বহস্তে সেই তরুতল মার্জ্জনা করিয়া রাখিয়াছেন! আমরা একবার সেখানে বসিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—"পরীস্থান"

(৩)

বাস্তবিকই পরীস্থান বটে! পর্ব্বতের অতি নির্জ্জন প্রদেশে একটি নিভৃত নিকুঞ্জ! চারিদিকে সমশীর্ষ শ্যামল শষ্পদল—কে যেন অতি যত্নে কোনও এক অজ্ঞাত মহাপুরুষের বিরামের জন্য মখমল নিন্দিত সেই সুচারু আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে! —পার্শ্বে একটি স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী—কুলুকুলু স্বরে ক্ষীণ-ঋজু তরঙ্গ তুলিয়া, সাদাপ্রাণ ঢালিতে ঢালিতে ছুটিতেছে! তটস্থিত তরুলতাগণের আকুল মিনতি উপেক্ষা করিয়া—পাষাণের দৃঢ়গতি-রোধ তুচ্ছ করিয়া উচ্ছ্বসিত বেগে উৎসাহভরে উন্মত্ত হইয়া অনন্তের পথে ছুটিতেছে! যেন বারিধির সেই নীলকায়ে আপন কায় মিশাইতে প্রাণের এত ব্যাকুলতা!—এত আকিঞ্চন! দূরে কয়েকটি স্বল্প স্ফুরিত উৎস—শিশু দূর্ব্বাদল সমূহে স্নেহ বিগলিত ধারে সুধাদানে সজীব রাখিয়াছে! স্তব্ধ স্থাবর জঙ্গমের প্রশান্ত চিত্ততা ভঙ্গ করিয়া, মধ্যে মধ্যে বন-বিহঙ্গিনীর সুধাময় সঙ্গীত! আমরা আত্মহারা প্রাণে সেই সমস্ত সুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম!

সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তাচল অন্তরালে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। চন্দ্র কিরীটিনী রজনী! মাঝে মাঝে দু'একটি তারকা কুল-বধূর ন্যায় ব্রীড়া সঙ্কুচিত দেহে সলজ্জ দৃষ্টিতে চন্দ্রিকা উৎসব দেখিতেছে! নৈশ নীলাম্বরের সেই উচ্ছ্বসিতশোভা দেখিয়া মানব মনে কতই ভাবের উদয় হয়! সুতরাং প্রাণের আবেগে একজন বন্ধু গাহিলেন—

"বিফল জীবন বিফল জনম—"

গানটী বড়ই মধুর লাগিল। বোধ হয় দূরে কতকগুলি হরিণ-শিশু বিচরণ করিতেছিল—বন্ধুর গান শুনিয়া একটি ত্রস্ত মৃগ শিশু দর্শন দিয়াই চকিতের ন্যায় বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল!

এই সময় বিষয়ান্তরে আমাদের মন আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম—কিছু দূরে একটি জল-প্রপাত—চন্দ্রকর প্রতিফলিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ বারিরাশি ঝর ঝর শব্দে গিরিমূলে ঢালিয়া দিতেছে! পাদদেশে একটি চিন্তানিমগ্ন পক্ককেশ বৃদ্ধ উপবিষ্ট—পার্শ্বে একটি অনিন্দ্য-সুন্দরী গিরি-বালিকা, শীতল সমীরণে রূপের লহরী তুলিয়া বন্য কুসুমগণের সহিত খেলায় নিযুক্তা! সে কি রূপ! সে রূপে কি কমণীয়তা! কল্পনা নয়নে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া, কতজনকে কত নিখুঁত চিত্র আঁকিতে দেখিয়াছি—বুঝি সেই! বুঝি, এ রূপরাশি এ পৃথিবীর নয়। বুঝি এ পরীস্থানে কোন পরী-বালিকা নিবিষ্ট মনে কুসুম চয়নে নিবেশিতা!

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইলাম,—বালিকা একবার মাত্র বিলোল দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল।

(৪)

"সে অনেক কথা।"

সন্নিকটবর্ত্তী জল-প্রপাতের কি নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ

অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—লিকাই—

"সে অনেক কথা—আর একদিন আসিবেন"—। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া কহিল "ঐ পল্লীতে আমার বাস।"—

বুঝিতে পারিলাম না বৃদ্ধের জীবন-নাটকের সহিত এই জল-প্রপাতের, কোনও গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না!

সকলে এই সমস্ত কথা আলোচনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বেশ ক্লান্তি বোধ হইতেছিল—যতই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি,—ততই পদযুগলও যেন অচল হইয়া আসিতে লাগিল। এখনও কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশ যাইতে হইবে—প্রকৃতির সহসা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সমগ্র আকাশ ধীরে ধীরে মেঘে আচ্ছন্ন হইল—হুহু শব্দে প্রবল বাতাস জলদ-জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছুটিতে লাগিল।—সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিণীর হাসি কান্না! আমরা প্রাণপণ গতিতে চলিলাম। কিছুদূরে যাইতে না যাইতে প্রবল ধারায় বৃষ্টি! আত্মরক্ষা করিবার মানসে একটি তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

* * * *

বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল—মেঘ কাটিল—বাতাস থামিল—চন্দ্ররশ্মি পূর্ব্বে ন্যায় আবার ফুটিয়া উঠিল। আমরা পুনরায় অগ্রসর হইলাম। এখানে রাস্তা ঘাট, বর্ষাকালে অত্যন্ত

পিচ্ছিল হয়, তাই ধরণীর শরণাপন্ন হইতে হইবে ভাবিয়া মৃদুগতিতে সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম।

সিক্ত কলেবরে যখন গৃহে ফিরিলাম—তখন রাত্রি অনেক—বাসার অন্যান্য সকলে নিদ্রাগত! অতরাত্রে তাহাদের আর বিরক্ত করা অনুচিত বিবেচনায়, আমিও তাহাদের ন্যায় সুকোমল শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়গত হইলাম—ক্ষুধাদেবী কিন্তু সে রাত্র জাগিয়া যাপন করিলেন!

লিকাই-প্রপাত।

(১)

রজনী প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। তরুণ অরুণের রক্তাভ প্রতিবিম্ব পূর্ব্বগগণে ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইয়াছে মাত্র। এখনও জগৎ স্তব্ধ—নিদ্রাতুর জীবগণের এখনও চেতনা সঞ্চার হয় নাই ; কেবল দু' একটি বায়স কুলায় পরিত্যাগ করতঃ ঊষা-সমাগম সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। বাড়ীর অন্যান্য সকলে তখনও নিদ্রিত। পূর্ব্বরাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে হইলনা। আজ একটু সকাল সকাল সেইখানে যাইতে হইবে ; বাসার ভৃত্যকে তদনুরূপ আয়োজন করিতে উপদেশ দিয়া আমি প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

৯টার সময় গৃহে ফিরিলাম। শুনিলাম বন্ধুগণ সকলে পূর্ব্বদিনের কথাই আলোচনা করিতেছেন। সকলেই আজ সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক।

যথাসময়ে সকলে বাহির হইলাম। গতকল্য যে পথে গিয়াছিলাম, আজ আর সে পথে না গিয়া অন্যপথ ধরিলাম।

ছিলাম। যাহা হউক ব্যাপার মুহূর্ত্ত মধ্যে উপলব্ধি হইল। দেখিলাম একটি লোক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে—নাসিকা প্রান্ত হইতে অবিশ্রান্ত রক্তধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত; নাকে হাত দিলাম—অতিকষ্টে নিশ্বাস পড়িতেছে—বুঝিলাম আমার আসিতে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইলে, তাহার জীবন রক্ষা দুরূহ হইত।

আমার একজন সঙ্গী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি কিছু বুঝিতে পারিয়া ছিলেন?"

"শোন বলিতেছি। তোমরা বোধ হয় জান পূর্ব্বে এখানে বড় ডাকাইতের ভয় ছিল—তাহারা কেবল মনুষ্য রক্তের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত।"

"শুনিতে পাই এখনও নাকি সে ভয় আছে?"

"হ্যাঁ। এখনও আছে, তবে ইংরাজ রাজের প্রবল শাসনে অনেক পরিমাণে কমিয়াছে—ততটা নাই—"

"আচ্ছা—কেন ওরূপ করিত জানেন কি?"

"জানি, সেই কথা তোমাদিগকে বারান্তরে কহিব। শুদ্ধ শুনিয়া রাখ যে এতদ্দেশীয় লোক এক প্রকার সর্প পালন করে—সেগুলি অনেকটা বোয়া জাতীয় সর্প। তাহাদের বিশ্বাস ঐ সর্প গৃহে থাকিলে, লক্ষ্মী অচলা হন—এবং ইচ্ছানুযায়ী প্রচুর অর্থাগম হয়। উক্ত সর্প মনুষ্য রক্ত ভিন্ন অন্য কিছু আহার করেনা—এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা খুন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। প্রায়ই মনুষ্যের নাসিকাভ্যন্তরে শাণিত লৌহ শলাকা

বিদ্ধ করিয়া রক্ত শোষণ করিয়া লয়। আমি বুঝিলাম এ সেই সর্প পালকের কাজ; ক্ষণমাত্র বিলম্ব অনুচিত মনে করিয়া, লোকটিকে স্বগৃহে আনয়ন করিলাম। আমার কন্যা 'লিকাই' আমার প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল—তাহারই হস্তে ঐ ব্যক্তির শুশ্রূষার ভার সমর্পন করিয়া কয়েকটি ঔষধির অন্বেষণে বহির্গত হইলাম।

ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল—আসিয়া দেখি লিকাইর একান্ত যত্নে মুমূর্ষ ব্যক্তির কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। আমি দুইটী ঔষধ প্রস্তুত করিলাম—একটি শক্তি সঞ্চারিণী—অপরটী রক্ত-নিবারিনী। লিকাই যথাক্রমে রোগীকে ঔষধ প্রদান করিতেছিল। সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল।

(২)

নিশাবসানে দেখিলাম লিকাই পূর্ব্ব রাত্রির মত ঠিক একই-ভাবে তাহার পার্শ্বস্থিত ব্যক্তির নিকট বসিয়া আছে। ইহাতে পরে যে কিছু ভাবান্তর ঘটিতে পারে এ কথা তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সে যাহা হউক লোকটীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল দেখিয়া আমি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহর—দিবসের কর্ত্তব্য কার্য্যে একাগ্রমনে ব্যস্ত আছি, এমন সময় লিকাই সেই দুপুরের দারুণ সূর্য্যকর মাথায় করিয়া আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন মা।" লিকাই কোনও উত্তর দিতে পারিলনা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তোমার সেই অপরিচিত ব্যক্তি ভাল আছে ত ?" লিকাই যেন কি বলিবার চেষ্টা করিল। দেখিলাম তাহার মুখ মণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইয়াছে। সে কিয়ৎক্ষণ মস্তকাবনত করিয়া রহিল। আমার মনে হইল অপরিচিত অতিথির প্রতি, বুঝি অলক্ষিতে লিকাইয়ের অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে! তাই কি ? নানাকথা ভাবিতেছি। অতিকষ্টে লিকাই বলিল—'সে গৃহে যাইবে'—'বেশ ত'!

লিকাই যেন কিছু মর্ম্মাহত! একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রাণের সমস্ত যাতনা ব্যক্ত করিয়া ত্বরিত পদে গৃহে প্রস্থান করিল।

লিকাই চলিয়া গেলে দিবসের অবশিষ্ট কাল আর কিছু ভাল লাগিলনা —মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তার স্রোত বহিতে লাগিল। একটু বেলাবেলি গৃহে ফিরিলাম। অভ্যাগত ব্যক্তি টিকে দেখিতে পাইলাম না।

'লিকাই! সে কি চলিয়া গিয়াছে ?'

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল 'হ্যাঁ'

আমি ভাবিলাম এ কি ?

তা'র পর হইতে মিরণ প্রায়ই আসিত। জানিনা তাহার মুখে কি এক মাধুরি—দেহে কি এক লাবণ্য বিরাজিত ছিল। দেখিলেই প্রাণের সমস্ত স্নেহ টুকু দিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা

করিত! কিন্তু আগে জানিতাম না যে সে আমার এরূপ সর্ব্বনাশ করিবে।

দু' এক ফোটা অশ্রুকণা বৃদ্ধের চক্ষুপ্রান্তে দেখা দিল। বৃদ্ধ শীঘ্র আর কিছু বলিতে পারিলনা।

আমরা আগে বুঝিতে পারি নাই, রজনীর প্রথম যাম অনেক ক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে! গৃহের কথা ভুলিয়া যে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া স্বদেশ—স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই তের নদী পারে—স্বেচ্ছায় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে আসিয়াছি, সেই উদরের দুর্নিবার চিন্তা ত্যাগ করিয়া শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে, শৈল শিখরে শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন পূর্ব্বক, নিবিষ্ট চিত্তে বৃদ্ধের এই কাহিনী শুনিতেছি।

বৃদ্ধ আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি পূর্ব্বে যেটি অনুমান মাত্র করিয়াছিলাম, ক্রমে সে ধারণা আমার দৃঢ় হইল! লিকাই সত্য সত্যই মিরণের অনুরাগিণী। শৈশবে মাতৃহারা বালিকাকে আমি অতিশয় ভাল বাসিতাম—সাহস করিয়া তিরস্কারচ্ছলে, তাহাকে কখন ও কিছু বলি নাই!—পাছে বালিকা মনক্ষুণ্ণ হয়—পাছে তাহার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে—মাতৃস্নেহের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া পাছে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে অভিভূত করে, এই ভয়ে তাহাকে কিছু বলিতে পারিতাম না;—বলিতে গেলে, অতীত-গর্ভ-নিহত এক পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া আমাকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিত!

লিকাই মিরণের প্রতি অনুরাগিণী—মিরণ ও কি বাস্তবিক লিকাইর প্রতি অনুরক্ত!—একটু ভাবিবার বিষয় হইল। কিন্তু বেশী দিন আমাকে ভাবিতে হইলনা। একদিন যাহা দেখিলাম, তাহাতে সমস্তই পরিব্যক্ত হইল!—বুঝিলাম, উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত!

*　　*　　*　　*

একদিন সন্ধ্যাকালে উভয়ের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল!* সাক্ষী রহিলাম আমি—আর নৈশ গগণের সচন্দ্র-তারকারাজি এবং পরীস্থানের ব্রততী-ভূষিত পাদপগণ—আর উপরের সেই সর্ব্ব-সাক্ষী দেবতা।

(৩)

"অপ্রতিহত কাল-স্রোত প্রভাবে মানব-হৃদয়ে কত পরিবর্ত্তন ঘটে কে বলিতে পারে। নবীন দম্পতি মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহাদের উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ, অকৃত্রিম ভালবাসা দেখিয়া বহুদিন পরে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু তখন জানিতাম না, তাহা ক্ষণিক।—জানিতাম না একদিন আমার সেই সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

---

* "* * * Marriage with the khásiäs is simply a conventional arrangement * * "

........*Sir W. W. Hunter. B. A. L. L. D., C. I. E. (Statistical Account of Assam, Pp. 217).*

বৃদ্ধের দুই গণ্ড বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বোধ হইল যেন কি এক অব্যক্ত যাতনায় তাহার হৃদয় মথিত হইয়া উঠিতেছে।—সে কি ?

"যথা সময়ে লিকাইর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিল। বৃদ্ধ বয়সে সেই দু'টী সুকুমার শিশুকে লইয়া দিন কাটাইতে ছিলাম—কালের তাহা অসহ্য হইল !

এই সময় লক্ষ্য করিলাম লিকাই যেন দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে—মিরণ সর্ব্বদা বিষম চিন্তা মগ্ন ! আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু প্রতিকার করিতে পারিলাম না।

একদিন কার্য্য হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি—দূর হইতে লিকাইর করুণ ক্রন্দন কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি গৃহে যাইলাম না। একটি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে কৃত সংকল্প হইলাম।

গৃহ-প্রাঙ্গণে মিরণ নীরব—নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান—পদপ্রান্তে লিকাই অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে—পার্শ্বে দু'টী রোরুদ্যমান শিশু ! সে দিকে কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই ! আমি আর থাকিতে পারিলাম না—ছুটিয়া গিয়া শিশু দু'টীকে বুকে ধরিলাম ! এ পর্য্যন্ত মিরণকে কখন ও কিছু বলি নাই—সে দিন তিরস্কারচ্ছলে বলিয়া ছিলাম—'পুরুষের এত দুর্ব্বলতা কেন ?' কি ভাবিয়া আমি উক্ত কথা বলিয়াছিলাম, তাহা আমি নিজেই তখন বুঝিতে পারি নাই ! আমার কথায় মিরণ আমারই সম্মুখে—পদাঘাতে লিকাইকে দূরে ফেলিয়া সবেগে

প্রস্থান করিল! কি বলিব, কষ্টে—অতিকষ্টে—কেবল কন্যার মুখ—আর সেই নিরপরাধ শিশু দু'টির মুখপানে চাহিয়া আমি ক্রোধ সংবরণ করিলাম! ভাবিলাম, একদিন মিরণ নিজের ভুল বুঝিতে পারিবে—একদিন তাহার হৃদয় দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে!"

(৪)

"সেই দিন হইতে মিরণ আর আসিত না। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, নবীন দম্পতীর সহসা এ মনো-মালিন্যের কারণ কি!

এদিকে লিকাই মৃত প্রায়! চক্ষের উপর তাহার সে কষ্ট আর সহ্য হইল না! একদিন নানা কথায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"লিকাই! মিরণের সহসা এরূপ বিরাগের কারণ কি জান!" অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া—কাতর কণ্ঠে লিকাই উত্তর করিল 'না'।

'সে কি কিছু বলে নাই!—

'না—কেবল একদিন মাত্র আপনার মনে বলিতে শুনিয়াছিলাম—শিশু-দু'টাই তাহার প্রণয়ের পথে প্রধান অন্তরায়—

*　　*　　*　　*

লিকাই আর বলিতে পারিল না। দারুণ কষ্টে তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল।

আমি বুঝিলাম;—বুঝিলাম কি ভুল করিয়াছি! হায়! হায়! লিকাই কেন আগে একথা বলে নাই!—সময় থাকিতে প্রতিকার করিতাম!—কিন্তু এখন উপায়!

*　*　*　*

অনেক চিন্তার পর মিরণের অন্বেষণে বহির্গত হইলাম।”

(৫)

“অতি অল্পক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল—আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। শিলং সহরের রাস্তায় তখনই লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি একাকী অরন্যাণীর মধ্য দিয়া মিরণের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি।

সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র কুটির—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মুক্ত-বাতায়নে একটি যুবক, বামকরে স্বীয় কপোল সংন্যস্ত করিয়া চিন্তামগ্ন! আমি ধীরে ধীরে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলাম। যুবক দেখিয়াও দেখিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সেই ভাব বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিলাম—শেষে গম্ভীর স্বরে ডাকিলাম ‘মিরণ—

যুবক সহসা শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সংযত ভাবে উত্তর করিল—‘কে’— ?”

‘আমি,—চিনিতে পারিতেছ না ?—

‘না—কি জন্য আসিয়াছ ?—

আমি অপমানিত বোধ করিলাম—বড় রাগ হইল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আর একবার ডাকিলাম—মিরণ—

সেই জীর্ণ কুটীর কাঁপাইয়া, সেই স্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল।

মিরণ উঠিল।—বাতায়নদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম—মিরণ আসিল না।

ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ! ক্রোধে সর্ব্বশরীর প্রজ্জ্বলিত হইতেছে—দারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে—মনে হইতেছিল আজ ইহার সমুচিত প্রতিফল দিয়া গৃহে ফিরিব—না,—অমনি লিকাইর বিষাদ মাখা মুখখানি মনে পড়িল! দুঃখে, কষ্টে—নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলাম! কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছিল!

প্রাণে এক অশান্তির বোঝা লইয়া গৃহে যাইতেছি—পথি-মধ্যে শুনিলাম, আমি বন্দী! পরক্ষণেই দুইজন পুলিশ প্রহরী কর্ত্তৃক আমি ধৃত হইলাম! আমার মনের মধ্যে তখন আগুণ জ্বলিতেছিল—সবলে দুইজন প্রহরীকে দুইদিকে নিক্ষেপ করিয়া, স্থির ভাবে সেখানে আমি দণ্ডায়মান রহিলাম! ভয়ে, আর কেহ আমার সম্মুখীন হইতে সাহস করিলনা!

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। একজন পুলিশের উপরিতন কর্ম্মচারী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

'তুমি বন্দী—'

'অপরাধ ?—'

'বিচার স্থলে জানিতে পারিবে।'—

আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলনা—আমি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়!

এই সময় চারিজন প্রহরী আমাকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। আমি একবার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলাম—অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। বোধ হইল পুলিশ কর্ম্মচারী যেন অপর কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সে-কে? দেখিবার জন্য সেই দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু এবারেও অন্ধকার আমার মনোরথ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিল। অতিশয় কুতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া রহিলাম।

এতক্ষণ একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘে চন্দ্রমা আবৃত ছিল—সহসা মেঘখানি অপসারিত হইয়া গেল। আমি সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম,—মিরণ!

(৬)

"নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে! নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল কালচক্র-ফেরে আমি সে দিন কারারুদ্ধ! একটি আকস্মিক ভাবী বিপদের আশঙ্কায় মন সর্ব্বদা শশঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। দুঃখে, ক্ষোভে চিন্তায় সে রাত্রি কোন প্রকারে অতিবাহিত হইল!

রজনী প্রভাতে শুনিলাম আমি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত! মিরণের নাসিকায় লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া আমি হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলাম! হায়! হায়! মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, আমার ধারণা ছিলনা! একদিন, যে মিরণকে আশু মৃত্যু গ্রাস হইতে, যত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম—সেই মিরণ

আজ আমার নামে এই মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে! আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বিচারস্থলে উপনীত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম—একটি অতিক্ষুদ্র—অতিতুচ্ছ কথাও গোপন করিলাম না। সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে আমার সে কাহিনী শুনিল!

একবার মিরণের অনুসন্ধান হইল। কিন্তু সে যে কখন পলায়ন করিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। বিচারক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি চিন্তা করিলেন। তা'র পর শুনিলাম—আমি মুক্ত!

বিচারককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি গৃহাভিমুখে ছুটিলাম। মিরণের অনুপস্থিতি আমার মনে কি জানি কি এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল!

আমি ছুটিতেছি—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছি—সম্মুখে অতিদূরে দেখিলাম একটি লোক প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট। শীর্ণকায়—মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন—যেন কি এক বিষম মর্ম্ম পীড়ায় নিপীড়িত হইয়া, সংজ্ঞাহীনের মত বসিয়া রহিয়াছে! আমি সেই মূর্ত্তি দেখিলাম—কিন্তু চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আবার দেখিলাম। আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল! সম্মুখে মিরণ! উন্মাদের ন্যায় বিকল হৃদয়ে বসিয়া কি ভাবে মগ্ন!—দুই চক্ষু দিয়া অবিরত তপ্ত অশ্রুধারা নির্গত হইয়া দেহ প্লাবিত করিতেছে! আমি সে দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না—স্নেহ ও করুণায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিতে লাগিল! আমি ডাকিলাম—'মিরণ'!

মিরণ একবার ঈষৎ হাসিল—তাহার সেই মর্ম্ম-ভে
শূন্যময় হাস্যে আমার হৃদয় শুষ্ক হইল ;—প্রাণের সমস্ত শক্তি
একত্র করিয়া আবার ডাকিলাম—'মিরণ'—

উত্তর নাই। নির্ব্বাক—নিস্পন্দ!

উন্মাদ আপন মনে বলিতে লাগিল 'লিকাই—লিকাই—হতভাগিনী—ক্ষত বিক্ষত দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালায়—দারুণ সন্দেহে যে কাজ করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি!—'

মিরণ একবার নয়ন উন্মীলিত করিল—একবার মাত্র আমার দিকে চক্ষু ফিরাইল—তা'রপর মুহূর্ত্ত মধ্যে গহন-কানন গর্ভে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

* * * *

আমি বড় আশায় গৃহে ফিরিলাম। একবার লিকাইর শিশু দু'টীকে বুকে ধরিয়া প্রাণের সমস্ত কষ্ট—সমস্ত দুঃখ দূর করিব! কিন্তু হতভাগ্য আমি!—গৃহে ফিরিয়া কি দেখিলাম—কি আশা করিয়াছিলাম—আর কি দেখিলাম!—দেখিয়া কেন মরিলাম না! বুঝি চিরদিন সে শোকস্মৃতি বহন করিতে অভাগার জন্ম হইয়াছিল!"

বৃদ্ধ আবার কাঁদিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, শিশু দু'টী ছিন্ন কণ্ঠ অবস্থায় গৃহ মধ্যে পতিত রহিয়াছে! তাহাদের রক্তে সমস্ত গৃহ প্লাবিত! একবার প্রাণের আবেগে তাহাদের সেই ছিন্ন দেহ বুকে ধরিলাম—যেন কতক তৃপ্তি অনুভব করিলাম! হঠাৎ

লিকাইর কথা মনে পড়িল। শোকরুদ্ধ কণ্ঠে—উচ্চৈস্বরে ডাকিলাম—

'লিকাই—লিকাই—

কেহ উত্তর দিলনা।

আমি একান্ত অধীর হইয়া আবার ডাকিলাম—

'লি—কা—ই'—উত্তর নাই!

আমি পাগলের প্রায় ঐ জল প্রপাতের শিখর দেশে ধাবিত হইলাম। লিকাই সেখানে বসিতে বড় ভালবাসিত—কি জানি সে যদি সেখানে থাকে! দেখিলাম সেখানেও লিকাই নাই!

ফিরিতেছি—উন্মাদের ন্যায়—দিশাহারা হইয়া ফিরিতেছি—কাহার করুণ ক্রন্দন শুনিলাম। বুঝিলাম সে 'লিটিকা' (লতিকা?) আমার দ্বিতীয়া কন্যা! এতক্ষণ তাহার কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি আবার সেই দিকে ছুটিলাম। দেখি, বালিকা বসিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতেছে! তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমারও কান্না আসিল—কিন্তু চক্ষেত জল নাই—কাঁদিব কি!

'লিটিকা! মিরণ কি আজ এখানে আসিয়াছিল?'

বালিকা আর কাঁদিতে পারিতেছিলনা। রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া বলিল—

'আমরা দুইজনে এখানে বসিয়াছিলাম। সহসা রক্তাক্ত কলেবরে মিরণ আসিয়া বলিল—শিশুদু'টী মরিয়াছে এখন সে নিশ্চিন্ত!'—

'আর অভাগিনী লিকাই ?—

বালিকা কিছু বলিল না —কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে কি দেখাইল ! হায় ! হায় ! প্রাণের যন্ত্রণায় অভাগিনী লিকাই শৈল-শিখর হইতে আপনার তুচ্ছ দেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া ইহ-জীবনের মত শান্তি লাভ করিয়াছে !!"

*　　*　　*

শুনিলাম সেই দিন হইতে উক্ত জল প্রপাতের নাম হইয়াছে—

"লিকাই—প্রপাত।"

মলিনী-রাজ।

(১)

চেরাপুঞ্জির প্রায় এক মাইল নিম্নে একটি "শিলা-সেতু" আছে। উহা দীর্ঘে প্রায় ৪০ ফুট এবং প্রস্থে অনধিক ১২ ফুট হইবে। বিশেষত্বের মধ্যে এই যে উক্ত সেতু একখানি মাত্র প্রস্তর দ্বারা গঠিত। এই সেতু সম্বন্ধে এদেশে একটি কিম্বদন্তি আছে। কোন সময়ে একটি গিরি-বালিকা নির্জ্জন নদীতীরে মৎস ধরিয়া বেড়াইত। একদিবস উক্তরূপ মৎসান্বেষণ করিতে করিতে বালিকা হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিত হয়। মূর্চ্ছা ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে—যেন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, নির্ম্মল আকাশে দু'একখানি শুভ্রতরল মেঘ চন্দ্র-কিরণে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তাহারই একখানি মেঘ অন্তরাল হইতে যেন একজন রূপ লাবণ্য যুক্ত সুশ্রী যুবা পুরুষ বহুবিধ রত্ন রাশি লইয়া তাহাকে বলিতেছে—'ধর, এই রত্ন রাশি তোমারই জন্য আনীত হইয়াছে—তুমি ইহা গ্রহণ কর—কখনও বিবাহ করিও না—তুমি এই নদী মধ্যে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিবে—তাহা একখানি মাত্র প্রস্তরে গঠিত হওয়া আবশ্যক; তুমি প্রস্তরময় গৃহে বাস করিবে—এই যে ধনরাশি অর্পণ করিলাম

তাহা তোমারই ভোগের জন্য ; যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমি পুনরায় তোমার নিকট আসিব ও ধনরাশি প্রদান করিব।'

বালিকা স্বপ্নভঙ্গে দেখিল, তাহার হস্তে প্রভূত পরিমাণে মুদ্রা। তখন সে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মনে করিতে লাগিল; ক্রমে তাহার সমস্ত কাহিনী একে একে স্মরণ পথে উদিত হইল। সে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করাইল; কিন্তু যখন তাহার গৃহ প্রস্তুত হইতেছিল, তখন সে তাহার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিণীতা হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে বালিকা যথা সময়ে একটি চক্ষুহীন পুত্র প্রসব করিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করে

বিগত ১২ই জুন, ১৮৯৭ সালের সর্ব্বধ্বংসী ভীষণ ভূমিকম্পে উক্ত প্রস্তরময় সেতু চূর্ণ হইয়া যায়। এখনও তাহার অংশ-গুলি নিম্নবর্ত্তী স্রোতস্বিনী গর্ভে পতিত আছে।

আমার জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ খ্রীষ্টান বন্ধু, একবার উক্ত শিলা-সেতু দর্শন করিতে গিয়া, দৈব বিড়ম্বনায় তথাকার একটি বৃদ্ধা রমণীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। উক্ত রমণী প্রসঙ্গচ্ছলে স্বীয়া উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের বিষয় যে মনোহর কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাহা অবিকল নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(২)

'সম সাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে, মলিনী-রাজ একজন ক্ষমতাবান রাজা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি

করিয়া চলিত। তিনি তাঁহার রাজধানী "মাতুরে"ই বসতি করিতেন। প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলেও তাঁহার রাজত্ব বহুদূর বিস্তৃত ছিল না। রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জনপদ স্বরাজ্যভুক্ত করিবেন। যুদ্ধকালে তাঁহার অধিক সৈন্য সামন্ত আবশ্যক হইত না—কারণ তিনি নিজেই অত্যন্ত সাহসী ও একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা। বিশেষতঃ বহুদিন তপস্যার ফলে তিনি দেবতা কর্ত্তৃক অক্ষয় জীবন লাভ করিয়াছিলেন—সুতরাং শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলেও পুনরায় নব জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। রাজার প্রতি দেবাদেশ ছিল, তিনি যেন কদাচ রমণীপ্রেমে আসক্ত না হ'ন।

'প্রথমেই মলিনী-রাজ, সিণ্টেঙ্গ-পতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সিণ্টেঙ্গ-রাজ ও তদানীন্তন একজন বলশালী নৃপতি বলিয়া গণ্য হইতেন—তাঁহার সৈন্য সামন্ত অপরিমিত ছিল—এবং বস্তুত সমস্ত খাসিয়া জনপদের প্রায় অর্দ্ধাংশ তাঁহারই আয়ত্তাধীন ছিল।

'যুদ্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিতেছে—সিণ্টেঙ্গ-অধীশ্বর ব্যতিব্যস্ত! ক্রমশঃই তাঁহার বলক্ষয় হইতে লাগিল—কি করিবেন, উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি মলিনীরাজকে তাঁহার নিকট ধৃত করিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত করিবেন। অর্থ লোভে অনেকেই মলিনী-

রাজকে ধৃত করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল করিয়াছিল, কিন্তু এক ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই সফলকাম হইতে পারে নাই। সিণ্টেঙ্গ-পতি মলিনী-রাজকে স্বীয় করায়ত্বে পাইয়া, স্বহস্তে অসি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

'সিণ্টেঙ্গ-পতি এখন নিশ্চিন্ত। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার স্বরাজ্য অধিকৃত হওয়া ত দূরের কথা, এক্ষণে, তিনিই অনায়াসে 'মাদুর' রাজ্য অধিকার করিতে পারেন। এতদিনে একটি প্রবল শত্রুকে স্বহস্তে নিধন করিয়া, সিণ্টেঙ্গ-রাজ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এদিকে সৈন্য মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল—'মলিনী-রাজ পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছেন।' সিণ্টেঙ্গ-নৃপতি প্রথমতঃ কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

'তখন সিণ্টেঙ্গ-পতি অমাত্যবর্গকে একত্রিত করিয়া কি করা বিধেয় এই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন।

'একদিন, দুইদিন, তিনদিন অতিবাহিত হইল, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, রাজা ও অমাত্যবর্গ চিন্তামগ্ন! তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবসে রাজা কি স্থির করিয়া সিণ্টেঙ্গ-রাজ্যের সমস্ত অবিবাহিতা কুমারীকে একত্র করিলেন। সেই অগণ্য বালিকার মধ্যে একটি মাত্র উন্মেষ-যৌবনা সর্ব্ব-সুলক্ষণা, সুরূপা কুমারী রাজ-প্রাসাদে আনীত হইল। কেহ জানিল না কেন—কিম্বা কেহ সে প্রশ্ন করিতে ও সাহসী হইল না।

(৩)

'রাজ-প্রাসাদের একটি আলোকময় নিভৃত কক্ষে বসিয়া বালিকা স্বীয় অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। কেন?—কি জন্য—কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে, সিণ্টেঙ্গ-পতি সেই সহস্র বালিকার মধ্য হইতে তাহাকে রাজ-গৃহে আনয়ন করিলেন? কুমারী ভাবিয়া ভাবিয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছে—ভয়ে, সন্দেহে, দুঃখে তাহার মন অভিভূত হইয়া উঠিল—বালিকা নানারূপ চিন্তায় ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রা অন্তে বালিকা দেখিল, সম্মুখে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি লইয়া সিণ্টেঙ্গ-পতি দণ্ডায়মান—বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিল না। ক্ষণ পরে সে স্থির চিত্তে শুনিল—

'কোনও এক গুপ্ত রহস্য উদ্ভাবনে তুমি এখানে আনীত হইয়াছ—সাবধান! এক্ষণে যাহা শুনিবে তাহা যেন ঘুর্ণাক্ষরে দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ লাভ না করে—কণা মাত্র একথা প্রকাশ হইলে, তোমার গোষ্ঠী শুদ্ধ সবংশে নিহত হইবে।

বালিকা শুনিতে লাগিল—

'এই বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার তোমার জন্য আনীত হইয়াছে। তুমি ইহা পরিধান করিয়া, উষা সমাগমের পূর্ব্বে "মাদুরে" গমন করিবে—কোনও ভয় নাই—তোমার সহিত আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর থাকিবে—সে তোমায় পথ প্রদর্শন করিবে। তুমি 'মাদুরে' উপস্থিত হইয়া, রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। প্রভাতে মলিনী-রাজ স্বীয়

প্রাসাদ সম্মুখে তোমার ন্যায় সুন্দরী কুমারী দর্শনে নিঃসন্দেহ তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে;

লজ্জায়, ভয়ে, রুদ্ধ নিশ্বাসে বালিকা সমস্ত শুনিল।

রাজা বলিতে লাগিলেন—

'এখনও তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য বলি নাই। তুমি কপট প্রেমে মলিনী-রাজকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার সহিত রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিবে। যেন তাহার রূপে মোহিত হইয়া আপনাকে যথার্থ প্রেম-সাগরে নিমগ্ন করিও না। মলিনী-পতি তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলে, তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, সে মরিলেও কি প্রকারে জীবন লাভ করে। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তুমি গোপনে আমাকে জানাইবে। দেখিও যেন সিণ্টেঙ্গ-পতির এই আদেশ অবমাননা না হয়।

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন—

'এক্ষণে শপথ করিয়া বল, আমার এ অনুজ্ঞায় স্বীকৃত আছ কি না?

বালিকা অনেক ভাবিয়া সম্মতা হইল।

* * * *

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। "মাত্নরের" প্রজাকুল এখনও সকলে গাত্রোত্থান করে নাই। মলিনী-রাজ প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী স্বর্গচ্যুত দেব-বালার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মলিনী-রাজ সেই

স্ফুটনোন্মুখ মন্দার কলিকা দর্শনে, দেবাদেশ ভুলিয়া গিয়া রমণী প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। অসহায়া রমণীকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন করিয়া, তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। বালিকাও রাজার প্রেমের প্রতিদান করিল!—

(৪)

'ইহার পর কিছুদিন পরে মলিনী-রাজ একদিন নব প্রণয়িণীর সহিত নৈশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আকাশে তখন কলঙ্কী * চাঁদ হাসিতেছিল—চাঁদের কলঙ্ক অনপনেয়। সে তাহার জেষ্ঠ্যা সহোদরা ভানুর প্রতি অবৈধ প্রেমাসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে ভানু, ক্রোধান্বিতা হইয়া চাঁদের মুখে অঙ্গার নিক্ষেপ করে—সেই অবধি চাঁদে কলঙ্ক। মলিনী-রাজ সেই কলঙ্কী চাঁদের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালিকা এতদিনের মধ্যে একদিন ও স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মরণ হয় নাই। আজ সুযোগ বুঝিয়া সে রাজাকে কত আদর, কত সোহাগ করিতে লাগিল। সুন্দরী প্রেমে মুগ্ধ মলিনী-রাজও তাহার সন্তোষ উৎপাদনে, কত অলৌকিক কথা—নানা আশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন! এইরূপ বহুবিধ প্রসঙ্গের পর বালিকা মলিনী-রাজের নিকট তাঁহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের রহস্য কথা

---

* খাসিয়ারা বলে, চন্দ্র পুরুষ এবং সূর্য্য স্ত্রীলোক। সলিল, তপন, অনিল সকলেই চন্দ্রের সহোদরা। চন্দ্রের জ্যোতি ইতি পূর্ব্বে সূর্য্যের ন্যায় প্রখরোজ্জ্বল ছিল—কিন্তু স্বীয় ভগিনী কর্ত্তৃক মুখে অঙ্গার নিক্ষেপনের পরে চাঁদের জ্যোতি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

শুনিতে বাসনা করিল। প্রেমোন্মত্ত নৃপতি দ্বিধা মাত্র না করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট তৎসম্বন্ধে সমস্ত নিগূঢ় গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলেন—চতুরা কপটী বালিকা অতি সাবধানে সেই রহস্য কাহিনী এক একটি করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া লইল।

'যথাকালে সিণ্টেঙ্গ-পতি অবগত হইলেন, মলিনী-রাজের জীবন কেবল মাত্র তাহার অস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে। সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও যদি অস্ত্রগুলি অস্পৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে মলিনী-রাজ পুনর্জীবন লাভে সমর্থ হয়েন—কিন্তু যদি সেই অস্ত্রগুলি স্থান ভ্রষ্ট করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ-পাখী আর কখনও দেহ পিঞ্জরে ফিরিয়া আসে না।

'সিণ্টেঙ্গ-পতি দুর্বৃত্তা বালিকাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া মলিনী-রাজের উদ্দেশে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

'মানবের পরমায়ু যখন শেষ হইয়া আসে, তখন পূর্ব্ব হইতেই তাহার অশুভ সূচনা হয়। মলিনী-রাজ প্রতিদিন স্নানের সময়, নির্জ্জন নদীতীরে তাঁহার অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া অতি সাবধানে ধৌত করিতেন। একদিন স্নানকালে মলিনী-রাজ স্বীয় অস্ত্রগুলি ঝরনার সন্নিকটবর্ত্তী একখানি প্রস্তরোপরি রক্ষণ করিয়া অন্য মনে অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে ছিলেন—সেই সময়ে সিণ্টেঙ্গ-পতি প্রেরিত গুপ্তচর নিঃশব্দে সে গুলি লইয়া পলায়ন করে এবং স্বীয় রাজ সকাশে আনয়ন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সেই দিন হইতে মলিনী-রাজের জীবন শেষ হয়।

নরবলী *

(১)

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি খাসিয়ারা এক প্রকার সর্প পালন করে, মনুষ্য রক্তই তাহাদের একমাত্র ভক্ষ্য এই ধারণায় খুন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদের এই নৃশংস কার্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অনেকের বিশেষ কৌতুহল জন্মিবার সম্ভাবনা। আমরা পুরাতন আসাম গেজেট † হইতে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'মর্ত্ত্যে দেবগণের একটি বিহার-সেতু ছিল। সেই স্বর্গীয় সেতু'পরি তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ বালক বালিকাগণ প্রায়ই খেলা করিয়া বেড়াইত। দেবগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া একটি সর্পকে সেই সেতু পরি-রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। সেতুর অনতিদূরে একটি বৃহৎ বিবর ছিল—সেই বিবর মধ্যে

* এই প্রবন্ধটি গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভায় অষ্টম অধিবেশনে (৬ঠা পৌষ ১৩১৬) পঠিত হইয়াছিল।

† Assam Gazette, August, 1882.

অজগর সর্প বাস করিত। তাহার উপর এইরূপ আদেশ ছিল যে একাধিক লোক সেতুর উপর দিয়া গমন করিলে, তাহার অর্দ্ধ সংখ্যককে সে বিনাশ করিতে পারিবে। শিশু সন্তানগণ যখনই সেই সেতু অতিক্রম করিতে যাইত, ঐ অজগর তাহাদের অর্দ্ধেককে গ্রাস করিয়া ফেলিত এবং অবশিষ্টকে সেতু পার হইয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিত। কিন্তু যদি কেহ কোন কার্য্য উপলক্ষে একাকী সেই স্থলে গমন করিত, সর্প তাহাকে কিছুই বলিত না।

'কালক্রমে অভিভাবকগণ যখন সকলে দেখিল যে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের অনেকানেক বালক-বালিকা সর্প কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া সেই অহি বিনাশে 'কৃত সংকল্প হইল। কি করা বিধেয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য একটি মহতী সভার আয়োজন করা হইল। কিন্তু নানারূপ উপায় উদ্ভাবন সত্ত্বেও কেহই সাহস পূর্ব্বক অহিবিনাশে স্বীকৃত হইল না।

কোনও গ্রামে "সুইদন"(Suidnoh) নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। লোকে তাহাকে খুব সাহসী বলিয়া জানিত। বাস্তবিক ও 'সুইদন' খুব বলিষ্ঠ ও অসীম সাহসী ছিল। সে সর্ব্বদা একাকী যথাতথা যাতায়াত করিত এবং পৃথিবীতে ভয় কাহাকে বলে, সে জানিত না। গ্রামস্থ সকলে একমত হইয়া ঠিক করিল যে 'সুইদন' ভিন্ন এ কার্য্য অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং একদিবস সকলে 'সুইদনে'র

গৃহে যাইয়া, তাহাকে অশেষ প্রকারে সম্মত করাইয়া, সর্প বিনাশ ভার অর্পণ করিল। 'সুইদন'ও তাহাতে অতি সহজেই স্বীকৃত হইল; কারণ সে জানিত সে একাকী, সর্প তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।

'একদিন যথা সময়ে দেব-সেতু অতিক্রম করিবার জন্য 'সুইদন' গৃহ ত্যাগ করিল, এবং-সঙ্গে করিয়া নানা প্রকার মাংস লইয়া গেল—উদ্দেশ্য তদ্বারা সর্পরাজকে বশীভূত করিবে। এইরূপ উপর্য্যুপরি দিন কয়েক মাংসাদি অর্পণ করায়, সুইদনের সহিত সেই কাল-সর্পের বাস্তবিকই বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। 'সুইদন' যখন যাহা বলিত, সর্প তখন তাহাই করিত। ক্রমে যখন উভয়ের বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ় হইল, তখন 'সুইদন' এক দিবস দুইটী তপ্ত লৌহ-শলাকা লইয়া, মাংস দিবার ছলে, সেই ফণীর মুখ-গহ্বরে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। সর্প দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে মৃত্যু কালে চীৎকার শব্দে এত অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিল, যে সমস্ত পৃথিবী কম্পমান হইয়াছিল, এমন কি 'সুইদন' নিজে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল।

'এদিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখে সে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তখন তাহারা জল সিঞ্চনাদি দ্বারা 'সুইদনের' চৈতন্য সম্পাদন করিল। সংজ্ঞা

লাভ হইলে 'সুইদন' সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল—এবং বাহির হইতে দেখিল যে কাল-সর্পের মৃত্যু হইয়াছে।

'চতুর্দ্দিকে 'সুইদনের' জয় কাহিনী এবং কাল সর্পের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল। তখন সেই বিনষ্ট সর্পের দেহ লইয়া কি করা উচিত, এই বিষয়ে অনেক আলোচনার পর অবশেষে এই স্থিরীকৃত হইল যে তাহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলাই শ্রেয়। অনন্তর সেই মৃতদেহটী খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খাসিয়া গৃহে প্রেরিত হইল। সকলে যথারীতি সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিল; কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ 'মফু' (Mawphew) নাম্নী গ্রামস্থ জনৈক বৃদ্ধা রমণী তাহার অংশটী খাইতে বিস্মরণ হইয়াছিল—এবং সেই জন্য উক্ত সর্প পুনর্জ্জীবিত হইয়া আজ পর্য্যন্তও খাসিয়াগণের নিকট অবস্থান করিতেছে"। *

খাসিয়াদিগের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস যে উক্ত সর্পকে নিয়ম মত মনুষ্যরক্ত দিতে পারিলে, সে গৃহস্থকে সর্ব্বথা নিরাপদে রাখে; এবং তাহার জন্য প্রচুর ঐশ্বর্য্য আনয়ন করে। খাসিয়াগণ

---

* মতান্তরে প্রকাশ যে উক্ত সর্পের মৃত দেহটী পার্ব্বত্যজাতি এবং অসভ্য সমতল বাসীগণের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হয়। সমতল বাসীগণ সংখ্যায় অধিক থাকায়, তাহাদের অংশগুলি নির্ব্বিবাদে খাইয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু খাসিয়ারা সংখ্যায় অল্পতা বশতঃ সমস্ত খণ্ডগুলি ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। যাহারা সক্ষম হয় নাই, বংশপরম্পরাক্রমে কেবল তাহাদেরই গৃহে উক্ত সর্প বিরাজমান আছে।

—লেখক।

বৎসরে একবার মাত্র মনুষ্যরক্ত প্রদান করে। যখন সেই সময় উপস্থিত হয়, তখন রক্ত-আহরণকারীগণ এক প্রকার মদিরা পান করে, এই মদিরা তাহাদের গৃহে প্রায় বৎসরাধিক বিদ্যমান থাকে। খাসিয়ারা বলে উক্ত মদিরা পান করিলে তাহাদের মনে যথেষ্ট সাহস ও বল উপস্থিত হয়, এবং মানবগণ সহজেই তাহাদের কর-কবলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

সচরাচর এক হস্তে একগাছি যষ্টী এবং অপর হস্তে রৌপ্যময় একখানি কাঁচি কিম্বা শলাকা ও একটি বংশনির্ম্মিত রক্তাধার লইয়া, খাসিয়াগণ স্বীকার অন্বেষণে বহির্গত হয়। কেহ কেহ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রপূত একপ্রকার চাউলও লইয়া যায়। সুবিধা মত কাহাকেও দেখিলে উক্ত তণ্ডুলকণা তাহার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে এবং মানবগণ নাকি সহজেই তাহাদের বশীভূত হয়। তখন তাহারা প্রথমে ধৃত ব্যক্তির অঙ্গুলি ও কেশের অগ্রভাগ কাটিয়া লয়,—পরে নাসিকারক্তে বংশাধার পরিপূর্ণ করিয়া সর্পকে উৎসর্গ করে। প্রায়ই নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে এই নৃশংস কার্য্য সম্পাদিত হয়। সর্পরাজের যখন রক্ত আহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন খাসিয়াগণ কক্ষ মধ্যে বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রসারণ করে—গৃহদ্বার ও বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া রাখে। একটি পিত্তলময় আধারে লব্ধ অঙ্গুলি ও কেশাগ্রভাগ এবং সঞ্চিত রক্ত স্থাপিত হয়। পরিবারভুক্ত সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে স্থিরভাবে উপবেশন

করে। তখন গৃহকর্ত্তা ধীরে ধীরে ঢাকে ঘা দিতে থাকে, এবং নিদ্রিত সর্পকে জাগরিত করিবার জন্য বলে "হে পিতৃ-পুরুষ-হিতাকাঙ্ক্ষী, হে মাতৃ-বংশ-শুভানুধ্যায়ী, তুমি আইস, আমরা তোমার জন্য যথাসাধ্য খাদ্য আয়োজন করিয়াছি। তুমি ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বত্র বিপদ হইতে রক্ষা কর,—যেন রোগ-শোক কিছুই এ পরিবার মধ্যে স্থান না পায়।" নাগরাজ তখন হৃষ্টচিত্তে সেই কক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করে। সর্প আসন গ্রহণ করিবামাত্র, সেই পূর্ব্বোক্ত পিত্তলময় আধারের উপর হত ব্যক্তির প্রেতাত্মা বিকট হাস্য করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। কালসর্প সেই প্রেতাত্মার পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে।

অসভ্য খাসিয়ারা বলে, তাহাদের রক্ষিত এই সর্প সর্ব্বদা ইচ্ছানুযায়ী আকার ধারণে সমর্থ। তাহার আহারের দিন ব্যতীত সে সতত আত্মগোপন করিয়া গৃহস্থের আলয়ে পরিভ্রমণ করে; সাধারণতঃ আত্মপ্রকাশ না করিলে, তাহাকে কেহই দেখিতে সক্ষম হয় না। ইহা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য বলা যায় না,—তবে শিলং এর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার মেজর গর্ডন সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে উহার সত্যতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। তিনি বলেন, একবার একটি মুসলমান ভৃত্য কোনও অপেক্ষাকৃত সভ্যতর খাসিয়া রমণীর প্রেমে আসক্ত হয়। অনেক দিন উভয়ে একত্র

সহবাসের পর ভৃত্যটি জানিতে পারে যে তাহার শ্বশুরালয়ে উক্ত সর্পের অধিষ্ঠান আছে। সে তাহাতে অত্যন্ত কৌতুহল পরবশ হইয়া সেই সর্প দেখিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। স্ত্রী ইহাতে কিছুতেই সম্মতা হয় নাই। অবশেষে স্বামীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বাধ্য হইয়া সর্প দর্শনের আশা প্রদান করে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে একরূপ শপথ করাইয়া লয়, যে সে কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না। মুসলমান ভৃত্যটি ইহাতে স্বীকৃত হইলে, তাহার খাসিয়া-স্ত্রী, গৃহ-কোণে ঘড়ির হেয়ার স্প্রিংএর ন্যায় একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রদর্শন করায়। ভৃত্যটি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করায়, রমণী সেই পদার্থটীর গাত্রে হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে থাকে; আশ্চর্য্যের বিষয়, ভৃত্যটি বলে, তখন সেই ক্ষুদ্র বস্তু একটি বৃহৎ সর্পাকারে পরিণত হইয়া, ফণা উত্তোলন পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে। এতদ্দর্শনে ভৃত্যটি যৎপরোনাস্তি ভীত হওয়ায়, তাহার স্ত্রী, তাহাকে পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া আইসে।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে খাসিয়াদিগের মধ্যে অনেক প্রকার কুসংস্কার দূরীভূত হইলেও এই সর্পপূজা এবং তদানুষঙ্গিক নরহত্যা আজ পর্য্যন্তও খাসিয়া-শৈলে,—এমন কি রাজধানী শিলং সহরের অতি সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্রীটিশ অধিকারের পূর্ব্বে এই সর্প-পূজা ব্যতীত অন্য

কারণেও জয়ন্তিয়া অধিবাসীদিগের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল।

শুনা যায়, ইহারা কপিলী নদীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করিত এবং সেই সূত্রে কপিলী দেবীর তুষ্টি সাধনে, সাধারণতঃ বৎসরে একটি এবং বিশেষ কোনও কার্য্য উপলক্ষে হইলে তদধিক মনুষ্যও উৎসর্গীকৃত হইত। ঐতিহাসিক লেখক অনেকে বলেন যে সিণ্টেঙ্গগণ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে নরবলি প্রথা আদৌ ছিল না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে উক্তরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। সিণ্টেঙ্গগণ হিন্দুধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেও এই নৃশংস কার্য্য চলিয়া আসিতেছে; তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পর, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, এই প্রথা কথঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ও নিয়মিত ভাবে সংঘটিত হইয়া আসিতেছিল।

এই নৃশংস নরবলী প্রথাই, ব্রীটিশ-রাজ কর্ত্তৃক জয়ন্তিয়া পর্ব্বত অধিকৃত হইবার একমাত্র কারণ। *

* যাঁহারা এই বিষয় অধিক বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে একবার Journal of the Asiatic Society of Bengal—1898 পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রবাসের ইতিহাস।





প্রবাসের ইতিহাস।

ভৌগলিক বিবরণ।

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল একবার একখানি মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম যে আমরা প্রাচীন ব্রিটন জাতির অদ্ভুত ইতিহাস অক্লেশে বর্ণন করিতে পারি এবং বল্‌টিক্‌-সাগর-কূলে জলদস্যুগণের অশেষবিধ উপদ্রবের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিয়া থাকি, কিন্তু স্বদেশের বিস্তৃত পার্ব্বত্য-ভূভাগের ও তত্রত্য অধিবাসীবর্গের, জ্ঞাতব্য কোনও কাহিনীই অবগত নহি, এবং ঐ সমস্ত জাতির সবিশেষ তথ্য জানিতেও আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র কৌতূহল জন্মে না। বাস্তবিক, অধিকাংশ বঙ্গবাসীর নিকট আসামের ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে শিলং এর নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানিতেন না—এবং অধুনা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হইলেও উক্ত সহরের বিবরণ অনেকেরই নিকট যেরূপ অপরিচিত, শিলংবাসী খাসিয়ার রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও সকলেই তদ্রূপ অনভিজ্ঞ। সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় দু'একটা কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

এই শৈল শ্রেণীর উত্তর প্রদেশে নবগ্রাম ও পুণ্যতীর্থ কামরূপ *; পশ্চিমে প্রহরী স্বরূপ গগণভেদী সুবিশাল গার-মহীধর; দক্ষিণে সোহাগময়ী স্নিগ্ধ "সুরমা" সুধীর ভাবে প্রবাহমানা—এবং পূর্ব্বদিকে নাগাধিষ্ঠিত অগণ্য গিরি শ্রেণী, হিড়িম্বা প্রদেশ ও কপিলী নদী। এই কপিলী নদী সম্বন্ধে, খাসিয়াদিগের মধ্যে একটি বিচিত্র পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহাদিগকে উক্ত নদী পার হইবার সময়, গৃহ হইতে আনীত যাহা কিছু আহার্য্য সামগ্রী নদীতীরে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু কেহ, সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য সহিত পার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাকে "কাপলেশ্বরীর" নিকট একাধিক যুগল মেষ ও তাম্রচূড় উৎসর্গ করিয়া যাওয়া বিধি আছে। এই অপরূপ বিধানের ভিতর যে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা এখনও সকলের নিকট অপরিজ্ঞাত!

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাঙ্গলার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন সেই সময় হইতেই খাসিয়া শৈলের বিবরণ কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। পার্ব্বত্য জাতিরা তখনও কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই, সুতরাং তাহারা আবহমান কাল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অবস্থান ও

* আমাদিগের দেশে ভৌগলিক তত্বানভিজ্ঞ অনেক লোকের ধারণা যে কামরূপে দিবাভাগে সিংহ গর্জ্জিয়া থাকে এবং বিদেশী পুরুষ তথায় পদার্পণ করিবামাত্র ভেড়া হইয়া যায়!!

—লেখক।

ঐতিহাসিক তথ্য।

পাথুরে চুণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিত। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই খাসিয়ার এই অবাধ বাণিজ্য সুচতুর ইংরাজ বণিকের চিত্ত আকর্ষণ করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় ইংরাজ যুবক খাসিয়া শৈলাভিমুখে আগমন করেন। সেই সময় নংক্লাও-নৃপতি ইংরাজগণের সহিত, শ্রীহট্ট হইতে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত একটী রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করণের জন্য সন্ধিপ্রস্তাবে আবদ্ধ ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সূত্রে উক্ত ইংরাজগণও নংক্লাওয়ে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু ঐরূপ অবস্থানকালে ইংরাজের সহিত খাসিয়ার কিছু মনোমালিন্য ঘটে, এবং পরিশেষে কতিপয় ইংরাজানুচরের অসাবধানতার জন্য উক্ত মনোবাদ ক্রমে প্রকাশ্য বৈরিতায় পরিণত হয়।

১৮২৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল খাসিয়া সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া লেফ্‌টানেণ্ট বেডিঙ্গফিল্ড এবং বার্লটন ও কতিপয় সিপাহিকে নিহত করে। এবম্বিধ অত্যাচারে অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজ-রাজকে সমর সজ্জা করিতে হইল—এবং ক্রমাগত তিন চার বৎসর ব্যাপি অনেক বিধ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে খাসিয়াগণকে সম্যকরূপে শাসিত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই খাসিয়া শৈল-শিখরে সমরকুশল ব্রিটনবাসীর জয়-পতাকা বিরাজমান।

ব্রিটিশ অধিকারের বহুপূর্ব্বে, খাসিয়াদিগের মধ্যে

প্রজাতন্ত্র ভিত্তিবদ্ধ হইয়া, অল্প লোক কর্ত্তৃক শাসন প্রণালীর পরিচালনা হইত। কোন কোন খাসিয়া জনপদে, বংশ-পরম্পরাগত 'সি-এম্'গণ রাজ্যস্থ প্রাচীন লোকদিগের মন্ত্রণা লইয়া স্বীয় প্রভুত্বানুসারে স্বাধিকারভুক্ত ভূভাগ শাসন করিত—এবং অন্যত্র প্রজাসাধারণ তাহাদের আপনাপনের মধ্যেই শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া লইত। রাজকার্য্যে প্রজার মতই প্রবল—রাজার অভিষেক বা পদচ্যুতি প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। তাহারা আপনাপন নেতাদিগকে স্বেচ্ছামত কার্য্যভার হইতে অপসারিত করিতে পারিত। উৎসবাদি উপলক্ষে সাধারণ ব্যয়ে পান ভোজনাদি দ্বারা প্রজাবর্গের পরিতৃপ্তি সাধন ও তাহাদিগের সর্ব্বদা আনন্দবর্দ্ধন করা রাজার পক্ষে বিধেয়, অধিকন্তু, অর্থদণ্ড বা বিপনি-লব্ধ দ্রব্যজাত সাধারণ হিতার্থে ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য—রাজার তাহাতে কোন অধিকার জন্মিতে পারিত না। একপক্ষে রাজশক্তি এতাদৃশ সংযত হইলেও অন্য বিষয়ে 'সি-এম'গণের হস্তে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। তাহারা প্রজার উপর কারাদণ্ড ও শারীরিক দণ্ড বিধান করিতে পারিত। পুরাকালে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষগণকে যুদ্ধযাত্রায় বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিতে পারিত। বাহিঃশত্রু সম্মুখীন হইলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইয়া প্রতি পক্ষের প্রতিরোধ সাধন করিত।*

নিয়ম ও শাসন তন্ত্র।

* সাহিত্য-সেবক—১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

কোনও বিষয় লইয়া রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ রাজা বা তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট নালিশ উপস্থিত করা হইত—এবং তৎপরে উক্ত বিবাদের সবিশেষ বিবরণ রাজা এবং তাহার পারিষদের নিকট বিবৃত্ত করা হইত। রাজকর্ম্মচারীগণ উক্ত কলহ আপোষে মিটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন—কিন্তু তাহাতে সফলকাম না হইলে, রাজ্যশুদ্ধ লোক লইয়া একটি দরবার গঠিত হইত—এবং তৎপূর্ব্বে একটি ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। ঘোষণাটি এই :—

'হে গ্রামবাসীগণ, হে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাগণ, যেহেতু রাজ্যে একটী কলহ উপস্থিত হইয়াছে—সেই কলহের ন্যায় বিচার করিতে, সকলের একত্র সম্মিলিত হইতে হইবে; সুতরাং হে যুবকগণ, হে বৃদ্ধগণ, হে শিশুগণ তোমরা কেহ কাষ্ঠ আহরণ, জল সিঞ্চন, কিম্বা কোনও কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র গমন করিতে পারিবে না। সকলকে মনযোগের সহিত বিবাদের কাহিনী শ্রবণ করিতে হইবে'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্তবিধ রাজ-আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর, নির্দ্ধারিত দিবসে রাজ্যের কোনও লোক গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে পারিত না। সকলকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইতে হইত। কেহ এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে, তাহার প্রতি অর্থদণ্ড কিম্বা অন্য প্রকার শাস্তির বিধান ছিল।

যথা সময়ে সকলে রাজ দরবারে উপস্থিত হইলে রাজার প্রধান কর্ম্মচারী বিবাদের কাহিনী সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিত। তখন বিবাদের বিষয় লইয়া নানারূপ তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইত; কিন্তু যখন ক্রমেই বচসা ঘনীভূত হইতে থাকিত, তখন আসামী এবং ফরিয়াদী উভয়ে দরবার সমক্ষে স্বীয় স্বীয় মস্তকাভরণ স্থাপনপূর্ব্বক রাজ সমক্ষে সত্য কথা বলিবার জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ লইত। রাজা তখন তাহাদের বর্ণনা শুনিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে বিচারপূর্ব্বক, উপস্থিত প্রজা-মণ্ডলীর মতানুসারে, ন্যায়দণ্ড বিধান করিতেন।

খাসিয়াদিগের মধ্যে, একাধিক লোকের ভিতর হইতে, প্রকৃত অপরাধী নির্ণয় করিবার অনেক প্রকার প্রথা ছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য; আমরা তাহার দু'একটি নিম্নে বিবৃত করিলাম।

দুই জন বা ততোধিক প্রজা দোষী সাব্যস্ত হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, প্রকৃত দোষী কাহারা তন্নির্ণয়ার্থ গভীর জলের মধ্যে কোনও এক স্থানে কয়েকটি তীক্ষ্ণ বর্ষা প্রোথিত করা হইত। রাজা অপরাধীগণকে বারিগর্ভে সেই বর্ষাবলম্বনে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকিতে আদেশ প্রদান করিতেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ভাসিয়া উঠিত সেই অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইত। কিন্তু এবম্বিধ প্রথায় অনেক সময় প্রাণহানি * ঘটে বলিয়া,

*যে সকল ব্যক্তিরা সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিত, তাহাদের আত্মীয়েরা তাহাদিগকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার জন্য—পাছে,তাহারা ভাসিয়া উঠে এই আশঙ্কায়—বংশদণ্ড কিম্বা অন্য কোনও বস্তু দ্বারা দৃঢ়রূপে নদী গর্ভে চাপিয়া ধরিত। ফলে এই দাঁড়াইত যে অনেক সময় তাহারা ঐরূপ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইত।

খাসিয়ারা আর একটি অপরূপ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিল। কোনও জলাশয়ের ভিতর, দুইটি আধার স্থাপিত হইত—প্রত্যেক আধারাভ্যন্তরে দুইখণ্ড স্বর্ণ এবং রৌপ্য রক্ষিত হইত। রাজাদিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি সুবর্ণ খণ্ড আনয়ন করিতে পারিত, সকলে তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি প্রদান করিত এবং রৌপ্য-খণ্ড আনয়ন কারীকে সমুচিতরূপে দণ্ডিত হইতে হইত। যদ্যপি উভয় অপরাধীই কাঞ্চনখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা হইলে, সমস্তই আপোষে মিটমাট হইয়া যাইত। পুরাকালে, খাসিয়া-দিগের মধ্যে দুই বা ততোধিক লোককে উকীল স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমার বিচার করা পদ্ধতিও প্রবর্ত্তিত ছিল।

ইংরাজ অধিকারের পর খাসিয়াগণের এই শাসন-নীতি সম্যকরূপে না হইলেও অনেকাংশে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইংরাজ-রাজ সুবিধা মত শাসনোদ্দেশে সমগ্র খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতটিকে তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। জয়ন্তিয়া পাহাড় একটি মহকুমারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একটি নিম্ন পদস্থ শ্বেতাঙ্গ-পুরুষকে তাহার শাসন ভার অর্পণ করা হয়। খাসিয়া শৈলের একের তৃতীয়াংশ ব্যতীত অবশিষ্ট ভূভাগকে করদ-রাজ্য বলা যায়। এই সকল করদ-রাজ্যের শাসন-কার্য্য সি'ম্, লিঙ্দো, কিম্বা ওয়াদাদার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে—তবে নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার ইংরাজ-আদালতেই নিষ্পন্ন করিতে হয়। যে অংশ টুকু ইংরাজ-রাজের খাস, তথায়ও গবর্ণমেণ্টের সাধারণ শাসন-নীতি পূর্ণমাত্রায়

প্রযোজ্য নহে। আবশ্যক মত অনেকস্থলে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন খাসিয়াগণ মঙ্গোলিয়া জাতির শাখা-সম্ভূত। বস্তুতঃ ইহাদের অবয়বের গঠন প্রভৃতি অনেকাংশে তদ্রূপ। ইহাদের আকৃতি খর্ব্বাকার, ইহারা বলিষ্ঠ ও নির্ভীক। নয়নদ্বয় কুটীল, নাসিকা প্রশস্ত ও অগ্রভাগ অবনত, গণ্ডস্থল সমুন্নত, শিরোদেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ওষ্ঠ পীবর। পুরুষগণের মুখায়তন প্রায়ই শ্মশ্রু বিহীন, কিন্তু অনেক স্থলে বিরল গুম্ফ শোভিত। পাদ-গ্রন্থিদ্বয়ের উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় ও বহুল মাংসপেশী যুক্ত। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহাদের প্রকৃতি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। ইহারা সরল, কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়ণ। সহজে কাহারও অনিষ্ট করেনা, কিন্তু অনিষ্টকারীকে বিধি-মত প্রতিশোধ দেয়।

আকৃতি-প্রকৃতি।

অসভ্য খাসিয়াগণের পরিচ্ছদাদির মধ্যে কৌপিন খণ্ড ও জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান ঝালর বিশিষ্ঠ আস্তীন বিহান পিরাণ; মস্তকে বনাত কিম্বা পশুচর্ম্ম নির্ম্মিত অপরূপ টুপী। অপেক্ষাকৃত সু-সভ্য এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরুষগণ অনেকেই 'বাঙ্গালী বাবু'র ন্যায় ধূতি চাদর ব্যবহার করিয়া থাকে—অধিকন্তু মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করে। ইংরাজী সভ্যতাভিমানি—"চার্চ্চ"-গামী সকলেই হ্যাট-কোট প্রভৃতি পরিধান করেন। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ কিছু অদ্ভুত প্রকারের; চাক্ষুষ না দেখিলে সহজে সম্যক উপলব্ধি হয় না। স্বহস্ত-প্রস্তুত "ডোরা" যুক্ত

পোষাক-পরিচ্ছদ।



দ্বিধারা জলপ্রপাত।

বস্ত্র খণ্ডে * খাসিয়া রমণীর কটিদেশ সুবেষ্টিত। তদুপরি আগুল্ফ-বিলম্বিত দুই দিকে দুই খণ্ড বস্ত্র, প্রত্যেকখানি উভয় বাহুর নিম্নদেশ দিয়া বিপরীত স্কন্ধদেশে গ্রন্থি-বদ্ধ। সর্ব্বোপরি একখানি পীঠ-বস্ত্র ও মস্তকে বিরল আবরণ। পুরুষগণের ন্যায় সমভ্রান্ত রমণীগণের পরিচ্ছদাদিও কতকটা পাশ্চাত্য ধরণের হইতেছে। নৃত্য কিংবা অন্য উৎসব সময়ে রমণীগণ গলদেশে প্রবাল-মালা ধারণ করিয়া থাকে। কুমারীগণ অবস্থামত স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুকুট পরিধান করে।

অধিকাংশ লোকই কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিগত ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে কৃষিকার্য্যকারীদিগের সংখ্যা ১৫৪৯০৭ জন ধার্য্য হইয়াছিল। আলু, পান, কমলা প্রভৃতির চাষই অধিক পরিমাণে হয়। এতদ্ভিন্ন অনেকে কুলীর কার্য্য করিয়াও অন্ন সংস্থানের উপায় করে। ইহারাও সংখ্যায় প্রায় ১৪০০০ জন।—(Census Report 1901)। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সাধারণ কুলীর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের দৈনিক আয় যথাক্রমে ।৵০ ও ।।০ আনা। যাহাদের ভিতর একটু সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ সুসভ্য ইংরাজগণের গৃহে 'আয়া' হইয়া কিম্বা প্রবাসী বাঙ্গালীর আলয়ে দাসী বৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করে। শুনিতে পাওয়া যায় খাসিয়ারা খুব স্বল্পাহারী। সচরাচর তাহারা দিনে দুই-

* আজকাল অনেকে ইহার পরিবর্ত্তে সহজ প্রাপ্য সেমিজ ও তদুপরি "জ্যাকেট" ব্যবহার করিয়া থাকে।

বার মাত্র আহার করে,—প্রত্যূষে কার্য্যে বাহির হইবার পূর্ব্বে একবার এবং সায়াহ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আর একবার। তবে যাহাদের অধিক মাত্রায় দিবসে কার্য্য করিতে হয় তাহাদের কেহ কেহ দ্বিপ্রহরেও একবার ভোজন করে। খাসিয়াগণ খুব মাংস-প্রিয; গো, কিম্বা শূকর মাংসই তাহারা সর্ব্বদা ভালবাসে। কিন্তু সিণ্টেঙ্গগণ * কদাচ গোমাংস ভক্ষণ করে না। খাসিয়াদিগের মধ্যেও স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়—যাহারা দুগ্ধ পান করে, গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং গোমাংসাহারীগণ দুগ্ধ পান করিতে বিরত থাকে।

জীবিকা।

মাংস-প্রিয় হইলেও শুষ্ক মৎস্য ও সফ্‌লাঙ্ † খাসিয়াদিগের প্রধান খাদ্য। ইহারা অত্যন্ত পানাসক্ত। তণ্ডুল হইতে একপ্রকার মদিরা প্রস্তুত করে—তাহাকে 'কা'ইয়াড্' বলিয়া থাকে। এই 'কা'ইয়াড্' না হইলে খাসিয়াদিগের আদৌ চলে না। ইহাদের কি পূজা-পার্ব্বণে, কি দৈনিক জীবনে 'কা'ইয়াড্' অবশ্য প্রয়োজনায় বলিয়া বিবেচিত হয়। তাম্বুল চর্ব্বণেও ইহারা অত্যন্ত পটু। পথ পর্য্যটন কালে ভুক্ত পানের সংখ্যা দ্বারা দূরত্ব নির্ণয় করে।

অসভ্য হইলেও, খাসিয়াগণ সাধ্যমত গৃহ ও প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সিণ্টেঙ্গগণ এখন পর্য্যন্ত ও গৃহে

* জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের অধিবাসীগণ 'সিণ্টেঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† কেশুরজাতীয় মূল বিশেষ (Fleminzia Vestita)

বাহিরে সর্ব্বত্র 'গোবর ছড়া' দেয়। কেহ কোনও নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিলে, গৃহ প্রবেশ করান তাহাদের কতকগুলি ক্রিয়া করা পদ্ধতি আছে। সেই সকল পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, এস্থলে বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। তবে একটিমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাসিয়া-শৈলের মধ্যে 'নারটিয়াঙ' একটী উপগ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসীগণ গৃহ প্রবেশ করান, হিন্দু দৈবতা "বিশ্বকর্ম্মার" * পূজা করিয়া থাকে, এবং তদুদ্দেশ্যে দুইটী কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। হিন্দু-প্রভাব কখনও এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, এবং সে বিষয় আলোচনা যদিও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু জয়ন্তিয়া-পর্ব্বত অধিবাসী খাসিয়াদিগের মধ্যে হিন্দু-জনোচিত অনেক প্রকার আচার ব্যবহার আজ-পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। খাসিয়াদিগের গৃহ প্রায়ই কঞ্চির বেড়া ও খড়ের ছাউনির হইয়া থাকে। দেওয়ালে গোবর ও মৃত্তিকা লেপন করিয়া, বর্ষা ও শীতের দারুণ প্রকোপ হইতে

বাস-গৃহ।

* The Syntengs at Nartiang worship *"u Biskurom"* (Biswakarma) The worship of Hindu God (Biswakarma, the architect of the Hindu Gods, is interesting and may be explained by the fact that Nartiang was at one time the Summer capital of the Kings of Jaintia, who were Hindus latterly and diseminated Hindu customs largely amongst the Syntengs.

—Major P. R. T. Gurdon, I. A.
(The Khasi)

আত্মরক্ষা করে। অধুনা সভ্য সমাজের সংস্পর্শে শিলং ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে খাসিয়াগণকে ইংরাজিফ্যাসানে সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে, এবং বিদেশী বিলাস উপযোগী অনেক সামগ্রী, কক্ষের শোভা সম্বর্দ্ধনে ক্রয় করিতে দেখা যায়।

খনিজ পদার্থের মধ্যে পাথুরে কয়লা এবং চূণা পাথর (lime stone) বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য স্থানে যাহা সিলেট বা ছাতক চূণ বলিয়া বিখ্যাত, তৎসমুদয়ই খাসিয়া শৈল-জাত। শুনা যায় অর্ণবপোতে ব্যবহারের পক্ষে এতদ্দেশীয় কয়লা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; কিন্তু স্থানান্তরে রপ্তানি করিবার কোনও সু-বর্ত্ম অভাবে এই সকল কয়লা কেবল মাত্র খাসিয়া-পাহাড়-বাসী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিলং বাজারে সাধারণতঃ মণ প্রতি এই কয়লার মূল্য ॥৵০ হইতে ৸৵০। স্থানে স্থানে, খৈরিম, মল্লিম, চেরাপুঞ্জী প্রভৃতি অঞ্চলে লৌহের আকরও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে খাসিয়াগণ এই সকল আকর হইতে নানা উপায়ে লৌহ প্রস্তুত করিত; অধুনা বিদেশী লৌহের বিস্তর আমদানী প্রভাবে উক্তরূপ প্রক্রিয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

খনিজ-পদার্থ ইত্যাদি

শৈশবে শুনিয়াছিলাম—"হট্টমালার দেশে, * * * তা'রা 'গাই বলদে' চষে"—খাসিয়া শৈল হট্টমালার দেশ কিনা জানি না, কিন্তু ইহাদের স্থানে স্থানে 'গাই-বলদে' চাষ করিতে দেখা যায়।

কৃষি-শিল্প।

পাহাড়ের সমতল খণ্ডেই কেবল উক্ত প্রকার চাষ সম্ভব পর। পর্ব্বত-প্রদেশের উপরিভাগে ‘খিউ’ (কোদালী বিশেষ) দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া খাসিয়ারা আলু প্রভৃতির চাষ করে। বর্ষার প্রথম ভাগেই সাধারণতঃ সমস্ত বীজ কিম্বা বৃক্ষাদি রোপিত হয়। এই বীজ বপন সম্বন্ধে অস্মৎদেশে প্রচলিত খনার বচনের ন্যায়, এদেশেও কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহাদের দু’একটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ওয়াট যু থাং জিঙ্‌থাং নি
বেট্ সিম্বায় হা বা স্নিউ ক্তি

অর্থাৎ—যে সকল ব্যক্তি অপয়া কদাচ তাহাদের দ্বারা বৃক্ষাদি রোপণ কিম্বা বীজ বপন করাইবে না।

থাং ডিঙ্ নি বেট্ সিম্বায়
হা বা স্নেন’ব্নায়
ইম্ হা বা সায় উ’ব্নায়

অর্থাৎ—চন্দ্রের বৃদ্ধির সময় নহে,—চন্দ্রের হ্রাসের সময় বীজ বপন করিবে; ইত্যাদি।

খাসিয়া-শৈলের উত্তরাংশে আলুর চাষ যেরূপ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, দক্ষিণাংশে কমলা লেবুর চাষও তদ্রূপ। আমাদের দেশে লোকের ভুল ধারণা শ্রীহট্টে কমলা লেবু জন্মে, বস্তুত খাসিয়া পাহাড়ই উহার প্রকৃত জন্ম স্থান।

শিল্প কার্য্যে খাসিয়ারা কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে

নাই। যদিও স্থানে স্থানে রেশমের বস্ত্রাদি বয়ন এবং অন্যবিধ কারুকার্য্য এখন পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিদেশী বস্ত্র ও সহজ প্রাপ্য অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের প্রভাবে, খাসিয়াদিগের সেই শিল্প ক্রমশঃই লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি।

খাসিয়াগণ খুব নিরীহ জাতি এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্দ্দোষ আমোদ-প্রিয়। বন্যজন্তু শীকার কিম্বা নির্জ্জন নদী তীরে মৎস্যান্বেষণ করিতে ইহারা অধিক আমোদ উপভোগ করে। শীকারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে শীকারীগণ পল্লী-দেবতার উদ্দেশ্যে ডিম পূজা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করে এবং তৎপরে অভীপ্সিত অরণ্যে কুকুর সমভিব্যাহারে, শীকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। যে ব্যক্তির শর সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য মৃগের শরীরে বিদ্ধ হয়, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, লব্ধ মৃগয়ার প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ সেই ব্যক্তির লভ্য। অন্যান্য সকলে এবং সমভিব্যাহারী সারমেয়গণ বাকী অংশটুকু সমান ভাগে প্রাপ্ত হয়। মৎস্যান্বেষণেও ইহাদের অত্যন্ত সহিষ্ণুতা দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের পাদদেশে, নির্জ্জন নদীতীরে, ছিপ হস্তে সমস্তদিন একাকী একভাবে বসিয়া আছে—বিরক্তি মাত্র নাই। কখনও কখনও ইহারা স্ত্রী-পুরুষ সকলে দলবদ্ধ হইয়া, অতি প্রত্যূষে মৎস্য ধরিতে বাহির হয়, এবং প্রায়ই যখন মরিচীমালী রশ্মিরাশী সংযত করিয়া অস্তাচলে গমনোন্মুখ হ'য়েন, সেই সময় ইহারাও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ছিপ দ্বারা মৎস্য ধরিবার রীতি প্রচলন থাকিলেও ইহাদের অধিকাংশ লোকেই মৎস্য ধরিতে এক প্রকার শিকড় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই শিকড় নদী মধ্যে একখানি প্রস্তরের উপর, অন্য একখানি প্রস্তর দ্বারা ক্রমাগত পেষণ করিতে থাকে; তাহাতে সমস্ত জল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং মৎস্যগণ ক্ষণেকের জন্য চেতনাহীনের ন্যায় উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে স্বীয় স্বীয় জাল দ্বারা অতি সহজেই মৎস্য সংগ্রহ করে।

অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে খাসিয়া রমণীর নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কোনও উৎসবই হউকনা কেন নৃত্য না হইলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই নৃত্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে ঢাক এবং বাঁশের বাঁশীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। খাসিয়াগণ বাঁশী বাজাইতে ও শিশ দিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে, ইহারা বিশেষতঃ বালকবালিকাগণ অত্যধিক অনুকরণপ্রিয়। একদিন একবার মাত্র স্থির চিত্তে যাহা শুনিতে পায়, তাহা অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। পুরুষগণ তীর খেলার বিশেষ পক্ষপাতী। খাসিয়া বালকবালিকাগণ অধুনা প্রবাসী বঙ্গবাসী কিম্বা ঔপনিবেশিক ইংরাজগণের নিকট অনেক প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীকেট্, ফুটবল,

এমন কি সর্ব্ববিধ ব্যায়ামও খাসিয়া সমাজে এখন স্থান পাইয়াছে।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ লইয়া সমাজের গঠন। আমরা সংক্ষেপে এইবার খাসিয়া-সমাজের রীতি নীতি বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইব। শিশু সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলেই উষ্ণজলে তাহাদের স্নান করান হয়,—এবং সূতিকাগার হইতে 'ফুল' (Placenta) লইয়া একটি মৃণ্ময় আধারে,—শিশুর নাম-করণ না হওয়া পর্য্যন্ত,—সংস্থাপিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পরদিনই জাত-পুত্রের নাম করণ হয়। আত্মীয় স্বজন যথারীতি নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করে।

সামাজিক-প্রথা—
—(নাম-করণ)।—

গৃহ-প্রাঙ্গনে পুরোহিত আসন গ্রহণ করিলে, তাহার সম্মুখে একটি সুরাপূর্ণ কমণ্ডলু, কিঞ্চিৎ তণ্ডুল চূর্ণ, তিন্তিড়ি এবং কয়েক খণ্ড শুষ্ক মৎস্য একখানি কদলী পত্রের উপর স্থাপিত হয়। ভূমিষ্ঠ সন্তান পুত্র হইলে, তাহার পার্শ্বে একটি ধনু ও তিনগাছি তীর রাখিয়া দেওয়া হয়—(উদ্দেশ্য শিশু পুত্র যোদ্ধা হই[illegible])—এবং কন্যা হইলে তৎপরিবর্ত্তে ভার-বহনোপযোগী পেটী ও দা রক্ষিত হয়। আচার্য্য যথারীতি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া, পূর্ব্বোক্ত কদলী পত্রে, কমণ্ডলু হইতে বিন্দু বিন্দু সুরা নিক্ষেপ করেন। সমাগত আত্মীয়-স্বজন তখন স্বেচ্ছানুযায়ী নাম প্রস্তাব করিয়া থাকেন। পুরোহিতকে, সুরা পাতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাবিত নাম গুলি একে একে আবৃত্তি করিতে



বিডন জলপ্রপাত (Beadon's falls).

হয়। এইরূপে শেষ সুরা-বিন্দু পতনের সময় আচার্য্যের মুখ হইতে যে নামটি উচ্চারিত হয়, শিশু সেই নামেই অভি-হিত হইয়া থাকে। গুরু-ব্যক্তিগণ শিশুকে বিক্রমশালী যোদ্ধা হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। অনন্তর শিশুর পিতা রক্ষিত 'ফুলটি' লইয়া তিনবার জাত-পুত্রের মস্তকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করায় এবং পরে গৃহ-সম্মুখস্থ কোন একটি বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় অতি সন্তর্পনে ঝুলাইয়া রাখে। ইহার পর সে গৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু পাদ-প্রক্ষালন না করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা। আত্মীয় স্বজনকে যথারীতি ভোজনে তুষ্ট করা হইলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। উল্লিখিত প্রথা খাসিয়া-শৈলের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত নাই; সম্প্রদায় বিশেষে বিভিন্নরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে যে গুলি মূলতঃ প্রায়ই একপ্রকারের আমরা কেবল মাত্র তাহাই উল্লেখ করিলাম।

খাসিয়াদিগের বিবাহের সহিত জাতিগত সমাজ ও ধর্ম্মের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণগুলি হইতে সম্যক পরিব্যক্ত হইবে। পরিণয় সামান্য চুক্তি মাত্র। আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা এই—

প্রথমতঃ কোনও বিবাহোপযোগী যুবক কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইলে দিন কতক তাহার সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হয়; যদি বুঝিতে পারে যে রমণী তাহার প্রতি অনুরক্তা, তাহা হইলে সে স্বীয় অভিলাষ, আত্মীয়-

বর্গের নিকট অকুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করে। অভিভাবকগণের যদি ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে যথাসময়ে কন্যাপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়। কন্যার পিতামাতা (কিম্বা অনেকস্থলে পাত্রা স্বয়ং) সম্মত হইলে, বিবাহের দিন স্থির হয়। কিন্তু এইরূপ দিন স্থির হইলেও সকল সময়ে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। কারণ দিন স্থির হইলে উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষগণ দেবতার উদ্দেশ্যে ডিম ভাঙ্গিয়া পূজা আরম্ভ করে। যদি সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থগিত রহিয়া যায়। অন্যথা—বিবাহের দিনে বর আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া কন্যা-ভবনে উপস্থিত হয়, এবং দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিন প্রভাতে পরিণীতা প্রণয়িণীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিবাহ কালীন কোনওরূপ বিশেষ আড়ম্বর নাই—তপ জপ মন্ত্রোচ্চারণ কিছুই নাই। বর ও কন্যা উভয়ে পরস্পরের পান ও সুপারির থলিয়া বিনিময় করিলেই বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। কখনও কখনও রৌপ্যময় অঙ্গুরীয় বিনিময় করিতেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। বিবাহের পর কন্যা মাতৃগৃহে থাকিলে, তাহার যাহা কিছু আয় তৎসমস্তই মাতৃ সংসার ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইয়া থাকে—স্বামীর তাহাতে অধিকার জন্মিতে পারে না। নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হইলে, স্বামী প্রায়ই পরিণীতা স্ত্রীকে স্বগৃহে আনয়ন করে না। সাধারণতঃ পুত্রাদি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্বশুরা-

পরিণয় পদ্ধতি।

লয়েই স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিবার রীতি অনেকস্থলে প্রচলিত।

বিবাহ সংঘটন যেরূপ চমৎকার, আবার বিচ্ছেদও তদ্রূপ কৌতুকাবহ। দম্পতি-যুগলের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটিলে কিম্বা প্রণয়ের তীব্র আশা কতকটা উপশমিত হইলে, একের বা উভয়েরই ইচ্ছাক্রমে, দুই দশ জন প্রতবেশীকে মধ্যস্থ মানিয়া পরস্পরে ৫ কড়া কড়ি অভাবে পাঁচটী পয়সা বিনিময় করিলেই, বিবাহ-বন্ধন চিরকালের নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর পতি-পত্নী স্বেচ্ছাক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।* বোধ হয় এই কারণেই অসভ্য হইতে সভ্যতর খাসিয়া রমণীগণের মধ্যে সতীত্ব জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয়। অনূঢ়া অবস্থায়, ইহারা সম্প্রদায় বা ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে, অনেকেই পরপুরুষাসক্ত হইয়া থাকে—কেহ কেহ আজীবন স্বৈরিতাচরণপূর্ব্বক জীবিকা সংস্থান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তবে এস্থলে একটি কথা অবশ্য উল্লেখ করা উচিত—রমণীগণকে পতিসহবাসকালে কখনও দ্বিচারিণী হইতে শুনা যায় না। অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করা খাসিয়াদিগের বিশেষরূপ নিষিদ্ধ। একটী কথা বলা হয় নাই—যে সকল গ্রামবাসীদের সমক্ষে খাসিয়া-

বিচ্ছেদ।

* Divorces amongst both Khasis & Syntengs are of common occurence—the result being that the children in many cases are ignorant of even the names of their father.

—The Khasi (Pp31).

দম্পতীর বিবাহ-বিচ্ছেদ সংঘটন হয়, তাহাদের কাহাকেও এই মর্ম্মে সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার করিতে হয়—'হে গ্রামবাসীগণ! আজ হইতে '—' এর সহিত '—' এর পরিণয় ভঞ্জন হইয়াছে; অতএব হে যুবকগণ তোমরা '—'র প্রেমাসক্ত হইতে পার, কেন না সে এখন অনূঢ়া,—আর হে যুবতীকুল! তোমাদেরও '—'র প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইতে আপত্য নাই, যেহেতু সে এখন অবিবাহিত।' সভ্য কিম্বা অসভ্য সমাজের অন্যত্র কোথাও এবম্বিধ রীতি প্রচলন আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু খাসিয়াদিগের মধ্যে ইহা এক অদ্ভুত প্রথা !!

খাসিয়া রমণীগণ স্বেচ্ছাচারী বা স্বাধীন ভাবাপন্ন হইলেও তাহারাই সমাজে অধিক মান্যা! 'স্ত্রীজাতিই খাসিয়াদিগের বংশের চূড়া।' মহিলাকুলই বিষয় সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে। খাসিয়ারা বলে—

"লঙ্ যাইড্ না কা ক্যিন্থেই"

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি হইতেই বংশের উৎপত্তি—সুতরাং ন্যায় শাস্ত্রানুযায়ী তাহারাই বিষয় ভোগের অধিকারিণী।

খাসিয়াদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—কিন্তু বহু বিবাহ নাই। স্ববংশ সম্ভূতা কোনও কন্যার পাণিগ্রহণ ইহাদের মধ্যেও অত্যন্ত দোষকর। তবে ইহারা মাতুলের অবর্ত্তমানে তদীয় কন্যাকে বিবাহ করা অযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করে না।

বোধ হয় এক হিন্দু ব্যতীত অপর কোনও জাতির মধ্যে

বিবাহ কালীন বর ও কন্যার বয়সের সামঞ্জস্য দেখিবার রীতি নাই। খাসিয়াগণের ভিতরও তদ্রূপ। অনেকস্থলে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়ক্রম অধিক দৃষ্ট হয়।

আমরা এইবার সংক্ষেপে মৃতের সৎকার সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। গৃহের কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, পরিবারভুক্ত কোনও লোক মৃতের কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া তিনবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকে;—মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছে, তাহা স্থিরীকরণই উহার উদ্দেশ্য। যদি কোনও উত্তর না পাওয়া যায় তবে গৃহস্থ সকলে বিলাপ করিতে থাকে। মৃত-দেহকে তিনটি মৃন্ময় আধার রক্ষিত উষ্ণ জলে স্নান করাইয়া একটী মাদুরের উপর শায়িত করা হয়। তৎপরে তাহাকে শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদাদি পরিধান করান হয়। একটী ডিম্ব মৃতের উদরে এবং অনধিক নয়টী শুষ্ক শস্যবীজ তদীয় মস্তকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। খাসিয়ারা মৃত-ব্যক্তিকে বহুমূল্য পরিচ্ছদাদিতে ভূষিত করে এবং অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণ অলঙ্কারাদিও প্রদান করে। শব পুরুষ হইলে একটী কুক্কুট—এবং স্ত্রীলোক হইলে একটী বলদ বা গাভী উৎসর্গ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য যে উক্ত প্রাণী মৃত-ব্যক্তিকে ঊর্দ্ধ-পথ প্রদর্শনে সহায়তা করিবে। উৎসর্গীকৃত জন্তুর কয়েক খণ্ড মাংস একত্র করিয়া একটী ঝুড়িতে স্থাপিত করে এবং ঐ ঝুড়িটী শবের মস্তকের নিকট ঝুলাইয়া রাখে। একটী

দাহ-প্রথা।

পাত্রে পানার্থ কিঞ্চিৎ জল এবং সুপারি প্রভৃতি প্রদান করা হয়—যেন মৃতের আত্মা পথে কোনও কষ্ট না পায়। যে কয়দিন শব গৃহে রাখা হয়, সে কয়দিন সকালে এবং সায়াহ্নে তাহাকে যথারীতি খাদ্যাদি প্রদান করা হয়—এবং তাহার প্রীতি উৎপাদানার্থ রাত্রে বংশীধ্বনির সহিত নানা-বিধ আমোদ প্রমোদ করা হয়। খাসিয়ারা সাধারণতঃ তিন রাত্রির অধিক কাল শব-দেহ গৃহে রাখেনা।

খাসিয়াদিগের মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত বা দাহ করা, উভয়বিধ পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই উভয়-বিধ কার্য্যে ইহাদের মধ্যে এত বাহ্যাড়ম্বর ও বিশেষত্ব আছে যে তাহা বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। তবে আমরা দেখিয়াছি যে আত্মীয়-স্বজনগণ, দাহ করিবার সময় নানা প্রকার বাদ্যাদি সংযোগে—সময়ে সময়ে বন্দুক প্রভৃতি আওয়াজের সহিত —কখনও কখনও (আত্মীয়গণ ধনা হইলে) দরিদ্রদিগকে রজতমুদ্রা দান করিতে করিতে, শবদেহ গৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া যায়। চিতা-শয্যায় মৃতদেহকে পশ্চিম শিয়র করাইয়া শয়ন করান হয়।

দাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, মুখ-অগ্নি প্রথা ইহাদের নাই। তবে অগ্নি সংযোগের সময় প্রথমে পরিবারভুক্ত অন্যান্য সকলে এবং পরে পুত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলে শবের চিতায় অগ্নি স্পর্শ করায়। দাহ সমাধা হইলে আত্মীয়গণ নির্ব্বাণোন্মুখ চিতায় মৃতের উদ্দেশে কতকগুলি সুপারি



প্রদান করিয়া, তাহার নিকট "হে আত্মীয়! যাও—ঈশ্বর ভবনে গিয়া তাম্বুলাদি চর্ব্বণে আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর;" —এই বলিয়া অন্তিম বিদায় প্রার্থনা করে। দেহ প্রায় ভস্মীভূত হইয়া গেলে জলদ্বারা চিতা নিবাইয়া দেওয়া হয়। তখন সকলে দগ্ধাবশিষ্ট কঙ্কাল কুড়াইয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

দেখা গিয়াছে, এই সকল সযত্নে সঞ্চিত কঙ্কাল ইহারা পুনরায় অত্যন্ত আড়ম্বর ও ক্রিয়াকলাপের সহিত ভূমিতলে প্রোথিত করিয়া রাখে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-বর্গকে খাসিয়া-দিগের দাহ পদ্ধতির সবিস্তার বিবরণ জানিবার জন্য পরলোকগত U Jeeban Roy প্রণীত "Ka Niam Khasi" নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আর একটী মাত্র কথা পাঠকবর্গের গোচর করাইয়া আমরা গ্রন্থ সমাপন করিব।

যাঁহারা শিলং আসিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে খাসিয়া পাহাড়ে—এবং তন্নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহে স্থানে স্থানে অনেক প্রকার প্রস্তর, কোনটী উচ্চভাবে—কোনটী বা লম্বভাবে প্রোথিত করা আছে। এই সকল যে কি, তাহা অনেকে অবগত নহেন। খাসিয়াদের অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে উচ্চভাবে প্রোথিত প্রস্তরগুলি পুরুষের—এবং লম্বভাবে শায়িত গুলি স্ত্রীলোকের স্মৃতি-স্তম্ভ। কথাটী যে একেবারে অমূলক

তাহা নহে। এই সকল প্রস্তর দেখিলে, অধুনাতন ইংরাজী সভ্যতাভিমানী—বিলাসপ্রিয় খাসিয়াগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কি পরিমাণ শক্তিশালী ছিল, তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শিলংএর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনর বলেন যে লম্ব ভাবে শায়িত উক্ত প্রস্তর খণ্ড সকল যে কেবল মাত্র স্মৃতি-স্তম্ভ তাহা নহে। খাসিয়াদিগের মহতী সভায় বা রাজদরবারে সমাগত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপবেশনার্থেও উক্তরূপ প্রস্তরাসন প্রস্তুত হইত। কাল মাহাত্ম্যে এক্ষণে কোনগুলি প্রকৃত স্মৃতি-স্তম্ভ, এবং কোন গুলিই বা পাষাণ-আসন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

সমাপ্ত